দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

চাই
'এক জনসংখ্যা'
নীতি : ভাগবত
পৃ: ২৯

৬৮ বর্ষ, ৮ সংখ্যা।। ৯ নভেম্বর ২০১৫।। ২২ কার্তিক - ১৪২২।। দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

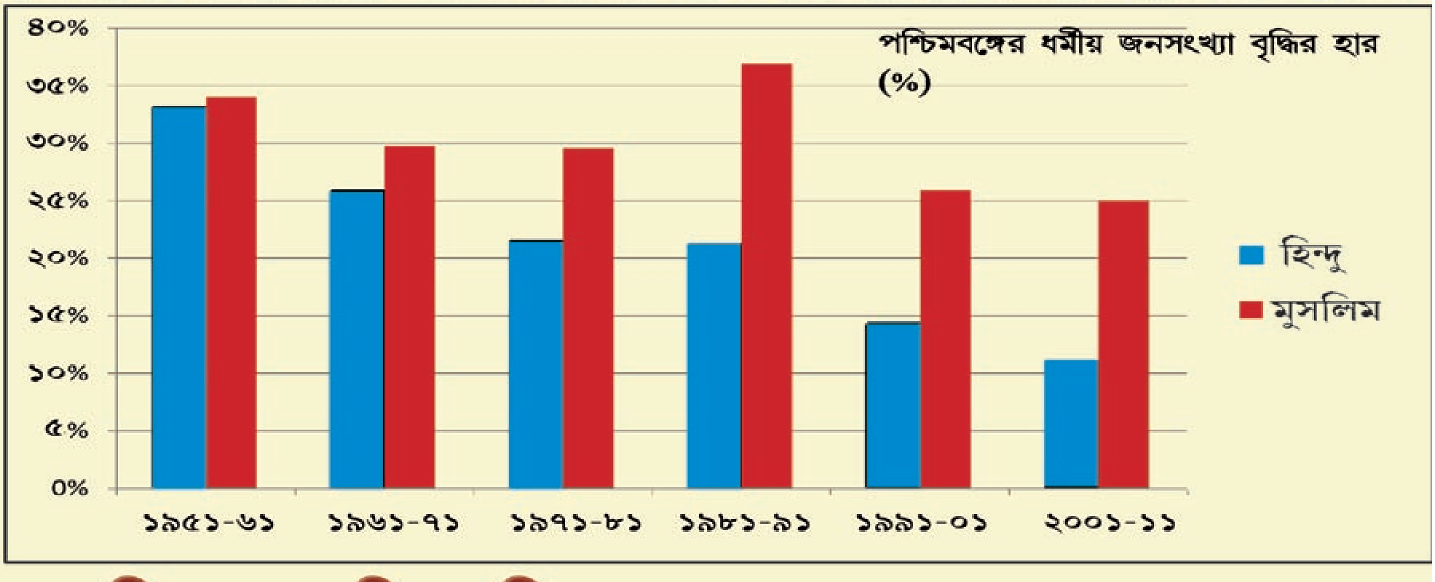

পশ্চিমবঙ্গ কি পশ্চিম বাংলাদেশ হতে চলেছে?

★ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫১ সালের ২০ শতাংশ মুসলমান ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭ শতাংশ

★ বাংলাদেশে ১৯৫১ সালের ২২ শতাংশ হিন্দু কমে গিয়ে ২০১১ সালে হয়েছে ৮.৭ শতাংশ

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ২২ কার্তিক, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

৯ নভেম্বর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

খোলা চিঠি : দিদিকে ক্ষমা করতে পারবেন দাদা?
□ সুন্দর মৌলিক □ ৯

গোমাংস ভক্ষণ এবং পুরস্কার ফেরত দেওয়ার নাটক আদতে রাজনীতির খেলা □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

ধর্মীয় জনগণনা : পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ হবার পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে □ মোহিত রায় □ ১১

শীতঘুম আচ্ছন্নদের প্রতি □ অনসূয়া চন্দ্র □ ১৭

প্রতিবাদী ভাষায় রাজনীতিকরণ বন্ধ হোক
□ ভাস্কর ভট্টাচার্য □ ২০

শক্তিপূজা ও স্বামীজী □ ভগিনী নিবেদিতা □ ২১

ত্রিবেণীর ডাকাতে কালী □ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল □ ২২

পুরনিগম নির্বাচন : গণতন্ত্রের প্রহসন
□ ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় □ ২৭

চাই ‘এক জনসংখ্যা’ নীতি : ভাগবত □ ২৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** □

সমাবেশ-সমাচার : ৩৬□ **খেলা : ৩৯**

শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, লেখক, কার্যকর্তা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

— *স্বস্তিকা পরিবার*

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বুদ্ধিজীবীদের দ্বিচারিতা

সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, বিশেষত পরিবর্তনের সময়। সরকারের কোনো নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁদের আছে। এক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতি থেকে তাঁদের কাছে নৈতিক সততা, সমদৃষ্টি ও নির্দিষ্ট মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা কাম্য। রাজনৈতিক সুবিধা আদায় ও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁদের একাধিপত্য বিঘ্নিত হওয়ার ভয়ে যখন তা করা হয়, তখন তাঁদের উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। 'সহিষ্ণুতা' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামে পুরস্কার ফেরতের ধুম পড়ে গেছে। বিষয়টাকে বামপন্থী উদারবাদী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত স্মৃতিভ্রংশ বলা যায়। এই দ্বিচারিতা ব্যক্তি, পুরস্কার এবং যে প্রতিষ্ঠানগুলির তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন— সবগুলিকেই কলুষিত করে। এবার এইসব বুদ্ধিজীবীদের দ্বিচারিতা নিয়ে লিখেছেন রমানাথ রায়, শেখর সেনগুপ্ত প্রমুখ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বুদ্ধিজীবীদের দ্বিচারিতা

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সহিষ্ণুতা লইয়া ইদানীং আলোচনা পর্যালোচনা শুরু হইয়াছে। এই বিষয়টিকে লইয়া আলোড়ন তুলিবার প্রচেষ্টায় কতিপয় সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ ও বিশিষ্টজন তাঁহাদের পূর্বে পাওয়া পুরস্কারগুলি ফেরত দেওয়ার মনস্থ করিয়াছেন অথবা কেউ কেউ ফেরত দিয়াছেন। প্রশ্ন হইল, আজ কেন এই প্রচেষ্টা? নয়নতারা সহগল তাঁর সাহিত্যসম্মান ফেরত দেওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি সেই সম্মানটি পাইয়াছিলেন ১৯৮৬ সালে। নেহরুর ভাগিনেয়ী হিসাবে তাঁহাকে সম্মান দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া সেই সময় অভিযোগ উঠিয়াছিল। ১৯৮৬ সাল হইতে ২০১৪ পর্যন্ত দেশে ৬ হাজারের বেশি ছোটবড় দাঙ্গা হইয়াছে, অথচ নয়নতারা সহগল এতদিন সাম্প্রদায়িকতার কথা চিন্তা করেননি কেন? ১৯৮৪ সালে সারাদেশে নৃশংসভাবে শিখদের হত্যা করা হইয়াছে আর নয়নতারা সহগল সরকারের কাছ হইতে পুরস্কার লইয়াছেন। এটাই তো লজ্জার! সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার কথা এতদিন বাদে তাঁহার মনে পড়িল কেন? অতি সম্প্রতি ৮৭ বছরের বিজ্ঞানী পি এস ভার্গব অভিযোগ করিয়াছেন, বর্তমান সরকার গণতন্ত্রের রাস্তা হইতে সরিয়া যাইতেছেন। অথচ দেশে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে জরুরি অবস্থার দিনগুলিতে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। বস্তুত জরুরি অবস্থার দিনগুলিতে যাঁহারা গণতন্ত্রকে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বন্ধক রাখিয়াছিলেন তাঁহারই আজ গণতন্ত্রের পক্ষে উমেদারি করিতেছেন। ২০১৩ সালে মজফ্ফরপুর দাঙ্গায় ৬২ জন, ২০১২-তে অসম দাঙ্গায় ৭৭ জনের মৃত্যু এবং ৯৫ শতাংশ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর অত্যাচারের পর এই বিশিষ্টজনদের সম্মান ফেরত দেওয়ার কথা মনে পড়ে নাই কেন? এই প্রসঙ্গে লেখক চেতন ভগৎ ঠিকই বলিয়াছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁহাদের হাত হইতে হিন্দি মাধ্যমের লোকেদের হাতে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া এই উচ্চবর্গের মানুষরা এত কথা বলিতেছেন। শ্রী মোদী ও অমিত শাহ যদি দুন স্কুলে পড়াশোনা করিতেন, নিখুঁত ইংরাজিতে কথা বলিতে পারিতেন, বিদেশি গার্ল ফ্রেন্ডদের লইয়া ঘোরাফেরা করিতেন, তবে তাঁহাদের এমন আক্রমণের মুখোমুখি হইতে হইত না। আর সহিষ্ণুতার প্রশ্নে বলিতে হয় বারবার মুসলমান জঙ্গিদের আক্রমণের পরেও এদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার শতাংশ কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। হিন্দুজাতি সবাইকে লইয়া চলিবার ক্ষমতা রাখে বলিয়াই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেছে। পাকিস্তানে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের কী দুর্দশা চলিতেছে তাহা সকলেরই জানা। আসলে বর্তমান শাসককে নাস্তানাবুদ করা এবং দেশের নাগরিকের কাছে এই সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই প্রচেষ্টা। অর্থমন্ত্রী এই জন্যই বলিয়াছেন, যাঁহাদের বিজেপি অ্যালার্জি রহিয়াছে কেবল তাঁহারাই পুরস্কার ফেরানোর কথা বলিতেছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, বুদ্ধিজীবীদের এতই যদি বিবেকের তাড়না থাকিত, তাহা হইলে পূর্বতন সরকারের আমলে যখন দুর্নীতিতে চারিদিকে ছিছি রব উঠিয়াছিল তখন কেন বিদ্রোহ করেন নাই?'

ইউপিএ জমানায় প্রাপ্ত পুরস্কার এনডিএ আমলে ফিরাইয়া দেওয়ার অর্থ কী? তাহা হইলে কি ধরিয়া লইতে হইবে ইউপিএ জমানায় এই পুরস্কার তাঁহারা উমেদারি করিয়া পাইয়াছিলেন, আজ দেশের মানুষ সচেতন হইতেছেন বলিয়া সেই পুরস্কার ফিরাইয়া সম্মান রক্ষা করিতেছেন? এই ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা, অসহিষ্ণুতা একটি অজুহাত মাত্র। বিজেপি নির্বাচনে জিতিবার পর হইতে কংগ্রেসীসহ বিরোধী নেতারা মুখ লুকাইয়াছেন আর তাঁহাদের স্থান লইতে আসরে নামিয়াছেন ভাড়াকরা মানুষেরা। নির্বাচনের দিনগুলিতে বারাণসীতে ইহারাই মোদীর বিরুদ্ধে প্রচারে অংশ লইয়াছিলেন। জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া আজ তাঁহারা নূতন খেলা শুরু করিতেছেন। দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন হইলে, দেশের সামান্যতম অংশও অসহিষ্ণু হইলে এই দেশের মানচিত্র কিন্তু পাল্টাইয়া যাইবে।

সুভাষিতম্

যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং
ন চাপি শীলং ন গুণো ন ধর্মঃ।
তে মর্ত্যলোকে ভুবি ভারভূতা
মনুষ্যরূপেন মৃগাশ্চরন্তি।। —(চাণক্যনীতি)

যাদের বিদ্যা নেই, তপস্যা নেই, দান নেই, সচ্চরিত্র নেই, গুণ নেই এবং ধর্ম নেই—তারা মর্ত্যলোকের ভারস্বরূপ ও মানুষের বেশে পশু ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুর্গাপূজার বিসর্জনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, লুঠপাট, প্রতিমা ভাঙা চলেছে মালদা জেলা জুড়ে

সংবাদদাতা : মালদা॥ মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গা পূজার বিসর্জন এবং মহরমকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, লুঠপাট এবং দুর্গা প্রতিমা ভাঙার খবরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহরমের পরের দিন প্রতিমা ভাসানোর জন্য নোটিশ দিয়েছিল। সেইমতো প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা হলেও মহরমের মিছিল থেকে হিন্দু দোকান ভাঙচুর, বোমায় হিন্দু যুবক আহত এবং মহরমের তাজিয়া যাওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত মুসলমানদের আক্রমণে নিরীহ পথচারীদের হয়রানি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে মুসলমান তোষণে মালদার সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে চলেছে। মালদার মথুরাপুরে মহরমের মিছিল থেকে উত্তেজিত জনতা দুর্গা মণ্ডপের পাশে রাস্তায় পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করে। দশেরা উৎসবের মাঠে মহরমের মিছিল করার জন্য চাপ দেয়, কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি। একইভাবে ইংলিশ বাজার থানার মিল্কিতে মহরমের আগের দিন দুর্গামণ্ডপের গেট ভাঙার জন্য পূজা কমিটিকে চাপ দেয়। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন রাজি না হওয়ায় মুসলমানরা পথ অবরোধ করার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ এসে ঘটনা সামাল দেয়। কালিয়াচকের খাস চাঁদপুরে মহরমের পরের দিন মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে বোমাবাজি করতে করতে হিন্দু পাড়ায় ঢুকে পড়ে এবং সেই বোমার আঘাতে শুভজিৎ দাস নামে এক ব্যক্তি আহত হয়। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ২২টি তাজা বোমা উদ্ধার করে। চতুর্থ ঘটনাটি ঘটে চাঁচলের কলিগ্রামে। মহরমের মিছিল নিয়ে কলিগ্রামের হিন্দু গ্রামের মধ্যে দিয়ে মিছিল নিয়ে মুসলমানরা যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। উত্তেজিত জনতা মিছিল থেকে বের হয়ে এস.ডি.ও-কে পাথর ছুঁড়ে মারে। বেশকিছু হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর করে। কিন্তু পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। এই ঘটনা প্রসঙ্গে চাঁচলের আইসি তুলসীদাস ভট্টাচার্যকে ফোন করে ঘটনা প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, ‘‘এই ঘটনা কোনো মিডিয়া কভার করেনি। আপনারা কেন করছেন?’’ তবুও স্বস্তিকার পক্ষ থেকে সেই ঘটনা প্রসঙ্গে জোর দেওয়া হলে তিনি জানান, ‘‘এ প্রসঙ্গে কিছু বলা যাবে না’’। অর্থাৎ পুলিশ নিজেদের গাফিলতি ঢাকা দিতে চেষ্টা করছে তা আরও একবার প্রমাণিত হলো। স্থানীয় বাসিন্দারা এ প্রসঙ্গে জানান, শাসক দলের রক্তচক্ষুর ভয়েই পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকছে।

পঞ্চম ঘটনা ঘটে বৈষ্ণবনগর থানার ভগবানপুর গ্রামপঞ্চায়েতের গ্রামে। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন করতে নিয়ে যাওয়ার সময় মুসলমানরা লাঠি, সড়কী নিয়ে আক্রমণ করে দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করে। পুলিশ সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও এই ঘটনা ঘটে। প্রতিমা রাস্তাতে রেখেই হিন্দুরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। রাত্রি ৩টায় প্রশাসন জোর করে ভাঙা প্রতিমা বিসর্জন করায় এবং হিন্দুদের গ্রেপ্তার করে। লোক দেখানোর জন্য কয়েকজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা দানের উদাহরণ। সংবাদমাধ্যম হিন্দুদের উপর অত্যাচার এবং মহরমের মিছিল নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য এবং ঘরবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা কিংবা প্রতিমা ভাঙার ঘটনা সরকারের ভয়ে প্রকাশ করতে পারে না। অথচ মুসলমানদের উপর সামান্য কিছু হতে না হতেই প্রশাসন এবং মিডিয়া সক্রিয় হয়ে উঠে। এইভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মুসলমান তোষণ এবং হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত এই সরকারের অপদার্থতাকে বারবার প্রমাণ করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, তৃণমূল দলতন্ত্রকে বজায় রাখতে এবং মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের জন্য যেভাবে দুষ্কৃতীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে তাতে আগামী দিনে এই রাজ্য ভয়াবহ নৈরাজ্যে পরিণত এবং অপশাসনের যূপকাষ্ঠে সাধারণ মানুষের বলি হওয়া— এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

এর মধ্যেই গত ২৬ অক্টোবর লক্ষ্মী পূজার দিন ইংলিশ বাজার থানার কাঞ্চনতার গ্রামের লাগোয়া সীমান্তবর্তী গ্রাম হরেকৃষ্ণ কোঙার কলোনিতে ৬৫ বছর বয়স্ক কালিপদ সরকার পুকুর পাহারা দেওয়ার সময় দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন। গত ২৬ অক্টোবর সকালে পুকুর পাড়ে তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ গ্রামবাসীরা দেখতে পায়। ফলে উত্তেজনা ছড়ায়। এই পুকুরের পাশে আরও তিন চারজন মুসলমান পুকুর পাহারা দিচ্ছিল। কিন্তু তাদের কিছু হয়নি, গ্রামবাসী পুলিশে খবর দিলে সকাল ৯টায়. ৫ ঘণ্টা দেরিতে এসপি দলবল সহ এসে হাজির হন। মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নিরীহ হিন্দুদের উপর যেভাবে অত্যাচার বেড়ে চলেছে তাতে হিন্দুরা দেশভাগের বিভীষিকা দেখতে পাচ্ছেন।

হুগলীর পুরশুড়ায় দুর্গা প্রতিমা ভাঙলো দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দুর্গাপূজা শুরুর আগেই প্রতিমা ভেঙে দেয় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবার ঘটতে দেখা গেছে। ব্যতিক্রম হলো না হুগলি জেলার পুরশুড়াও। জানা যায়, গত ১৫ অক্টোবর পুরশুড়ার সোদপুর দুর্গামণ্ডপে থাকা লক্ষ্মী, গণেশ ও সরস্বতীর মূর্তি ভেঙে দেয় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় এলাকায় প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা পুরশুড়া থানায় অভিযোগ জানালে প্রথমে কোনোরকম ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি পুলিশকে। পরে স্থানীয় হিন্দুরা থানা ঘেরাও করে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় জনতা রাস্তা অবরোধ করে। পরে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশ জানায়, তদন্ত চলছে।

সি আই এ-প্রধানের ই-মেল ফাঁস

ভারতে সন্ত্রাস অব্যাহত রাখতে হাতে হাত পাক-আমেরিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ-প্রধান জন ব্রিন্যান-এর ব্যক্তিগত ই-মেল প্রকাশ্যে এসে ভারতে সন্ত্রাসবাদের প্রসারে পাকজঙ্গি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। উইকিলিকসের সাম্প্রতিক ফাঁস হওয়া তথ্যে এও দেখা যাচ্ছে যে পাক গোয়েন্দা সংস্থাও কীভাবে ভারতে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় অবধি খোঁজ না পাওয়া যে হ্যাকারের উদ্যোগে জন ব্রিন্যানের ব্যক্তিগত ই-মেল ফাঁস হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে— মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা মার্কিন সরকারকে বোঝানোর চেষ্টা করছে আফগানিস্তানে পাকিস্তানের নক্কারজনক ভূমিকার বিরোধিতা করা মার্কিন প্রশাসনের উচিত কাজ হবে না। সংশ্লিষ্ট ই-মেলটি ২০০৮ সালের। তখন আফগানিস্তান পুনর্গঠনের কাজে ভারতের বেশ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের ক্রমাগত নেতিবাচক ভূমিকার জন্য, বিশেষ করে তালিবানদের সঙ্গে হাত মেলানোয়, ভারত তার দায়িত্ব পালনে লাগাতার বাধার সম্মুখীন হচ্ছিল।

সি আই এ-ও ক্রমশ উদ্বিগ্ন হচ্ছিল আফগানিস্তানে ভারতের প্রভাব বাড়ায়। যে কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে তাদের আর্জি ছিল ‘বিশেষ সংযোগরক্ষাকারী’ নিয়োগ করার, যিনি ‘আফগানিস্তানে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের উদ্বেগকে উপশম’ করার পথ খুঁজে বের করবেন। ই-মেলে ব্যবহৃত এ ধরনের ভাষাই বুঝিয়ে দিচ্ছে আফগানিস্তানে কীভাবে ভারত-বিরোধিতার জমি তৈরি করেছিল পাকিস্তান আর এব্যাপারে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থারও পরোক্ষ মদত ছিল। সূত্রের খবর, আফ-পাক অপারেশনে আমেরিকা ভারত-পাকিস্তান দু’দেশকেই খুশি রাখতে চেয়েছিল। মুম্বইয়ে ২৬/১১ ঘটনার অব্যবহিত আগে ২০০৮-এর ৭ নভেম্বর মার্কিন সেনেট সিলেক্ট কমিটির সঙ্গে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের বৈঠকেও পাকিস্তান নিয়ে নরম নীতি নেওয়া হয়। সুতরাং বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ দমনে আমেরিকা যে কোনোদিনই আন্তরিক ছিল না তা ফের প্রমাণিত হলো বলে কূটনৈতিক মহল মনে করছে।

কিন্তু একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে ফাটা (ফেডারেল অ্যাডমিনিস্টারড ট্রাইবাল এরিয়াজ)-র গ্রহণযোগ্যতাকে কেন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে সি আই এ। বিশেষ করে ফাটার তালিবান বিরোধী এবং জঙ্গি-বিরোধী ভাবমূর্তিও যেখানে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মুখে। ফাঁস হওয়া রিপোর্ট বলছে এক্ষেত্রে আমেরিকা দ্বিমুখী কৌশল নিয়েছিল। আফগানিস্তানে সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রভাব বজায় রাখার জন্য ভারতকে রোখা আমেরিকার পক্ষে জরুরি ছিল। অন্যদিকে পাকিস্তান চাইছিল আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে তাদের সেনা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নিলে যাতে সেদেশে ভারত ও ইরানের প্রভাবে একটা সমতা রক্ষা করা যায়। সেজন্য তালিবানের সঙ্গে একটি কার্যকরী সম্পর্ক রক্ষা করতে। আমেরিকা-পাকিস্তানের এই দুই স্বার্থ পরস্পর মিলে যাওয়াতেই ভারত-বিরোধিতার নকশা তৈরি হয়েছিল বলে কূটনৈতিক মহল মনে করছে। উইকিলিকসে এও দেখানো হয়েছে যে, সি আই এ এবং এফ বি আই-এর টীম সদস্যরা এই সময় একইসঙ্গে ঘন ঘন ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান পরিদর্শন ও ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। সব মিলিয়ে সি আই এ-প্রধানের ই-মেলের যেটুকু ফাঁস হয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে মুখে যতই বিশ্বজুড়ে চলা সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার কথা বলুক ভারতে পাক-জঙ্গিবাদের প্রচ্ছন্ন মদতদাতা তারাই। আর পাকিস্তান যে ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাতে কতদূর সক্রিয় হতে পারে এটা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

পরলোকে বাদল ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি বিধায়ক বাদল ভট্টাচার্য গত ১ নভেম্বর কলকাতায় বাঙ্গুর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। কলেজ জীবনে বিদ্যার্থী পরিষদের তিনি সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৯৯ সালে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে জেতেন। বামফ্রন্টের জমানায় বিধায়ক হিসেবে যথেষ্ট তৎপর এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ২০০১ পর্যন্ত তিনি বিধায়ক ছিলেন। বিধানসভার অধিবেশনে তাঁর দলের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবেই তিনি নজর কাড়তে সমর্থ হয়েছিলেন। মিশুকে স্বভাবের হওয়ায় সকলের সঙ্গেই তাঁর সদ্ভাব বজায় ছিল। তাঁর মৃত্যুতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তরফেও শোক প্রকাশ করা হয়েছে। বিধানসভায় বাদলবাবুর মরদেহে মালা দেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র সহ বহু অনুগামী ও বন্ধুকে রেখে গেছেন।

হায়দরাবাদে নির্মাণ হতে চলেছে ১৪ কোটির বালাজী মন্দির

নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ হায়দরাবাদে মোট ১৩.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩.৫ একর জায়গার উপর গড়ে উঠছে শ্রীবেঙ্কটেশ্বরের (বিষ্ণু) মন্দির। তিরুমালা তিরুপতি দেব-ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ১২ নং বানজারা হিলসে গড়ে তোলা হবে এই সুবিশাল মন্দির। পাশাপাশি এও জানা যায়, হায়দরাবাদেই বেঙ্কটেশ্বর মন্দির সংলগ্ন গড়ে উঠবে মহাগণপতি- দেবের মন্দির। মূলত বানজারা হিলসের যে জমিতে মন্দির তৈরি হতে চলেছে তা গত কয়েকবছর ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। স্থানীয় সরকারি আধিকারিকগণ মন্দির কর্তৃপক্ষকে জানায়— সেই জমি ব্যবহার না হলে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তা শুনে তড়িঘড়ি তিরুমালা তিরুপতি দেব ট্রাস্টের পক্ষ থেকে

প্রস্তাবিত বালাজী মন্দির।

বালাজী মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঠিক যে কারণে জমি পেয়েছে তিরুমালা তিরুপতি দেব ট্রাস্টি বোর্ড সেই শর্ত পূরণ করতে না পারলে ফিরিয়ে নেওয়া হোত বলে সরকারি সূত্র মারফত জানা যায়। কিন্তু কয়েকমাস যেতে না যেতেই তারা সিদ্ধান্ত নেয় মন্দির গড়ে তোলা হবে। ট্রাস্টি বোর্ড আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ৭ একর জায়গা জুড়ে মাদুরাই অরবিন্দ চক্ষু হাসপাতালের একটি শাখা তিরুপতিতে নির্মাণ করা হবে। ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই হাসপাতাল গড়ে উঠলে এক বিশাল সংখ্যক ভক্ত এবং অন্যান্যদের চিকিৎসা করাতে সুবিধা হবে। এক্ষেত্রে তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থান কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল পরিচালনর ক্ষেত্রে প্রতি বছর প্রতি একর থেকে কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করবে। সূত্র মারফত জানা যায়, শিঘ্রই ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির নির্মাণের যে কাজ শুরু হবে তা বিশ্বের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংরক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরে সংরক্ষণ সংক্রান্ত এক যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করলো সুপ্রিম কোর্ট। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানার সুপার স্পেশালিটি মেডিকেল কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত যোগ্যতার মাপকাঠিকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংরক্ষণের বিরোধিতা করে। বিচারপতি দীপক মিশ্র ও পিসি পন্থের বেঞ্চ জানিয়েছেন যে সুপার স্পেশালিটি কোর্সের ক্ষেত্রে প্রাথমিক যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে মেধাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বারবার কেন্দ্র ও রাজ্যকে মনে করিয়ে দিলেও তা উপেক্ষিত থেকে গেছে। সুপ্রিম কোর্ট আরো বলেছে, মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলিতে সংরক্ষণ থাকাই উচিত নয়। যেহেতু উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের সঙ্গে দেশের স্বার্থ জড়িয়ে আছে এবং জনসাধারণকে প্রদেয় স্বাস্থ্য পরিষেবার মনোন্নয়নও এর উপর নির্ভরশীল। এর পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট আশা প্রকাশ করেছে যে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি দেরি না করে গুরুত্বসহকারে বিচার-বিবেচনা করে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করবে।

সতীপ্রথার অবসান হলে বহুবিবাহ নয় কেন : সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মুসলমান সমাজে পুরুষদের বহুবিবাহ ও খামখেয়ালি 'তালাক' উচ্চারণে বিবাহবিচ্ছেদের মতো প্রথার অবসানে মুসলিম পার্সোনাল ল'-কে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হওয়ার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর অধীনে তালাক ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে কোনো নিরাপত্তা না থাকায় মুসলমান নারীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্ট এই সকল প্রথার যাথার্থতা পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিচারপতি

বিচারপতি গোয়েল

বিচারপতি দাভে

এ আর দাভে এবং এ কে গোয়েলের বেঞ্চ বলেছে যে, বিবাহ এবং উত্তরাধিকার ধর্মের অংশ নয়। সাংবিধানিক নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও মুসলমান মহিলারা বৈষম্যের শিকার। জাভেদ বনাম হরিয়ানা রাজ্য সরকারের মামলায় তিনজন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে যে বহুবিবাহ সর্বজনীন নৈতিকতার পক্ষে ক্ষতিকর তাঁদের বক্তব্য 'সতী' প্রথা যদি অবসান হতে পারে তবে বহুবিবাহও বন্ধ হতে পারে। মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের অধীনে মুসলমান মহিলাদের বৈষম্যের ব্যাপারটিকে জনস্বার্থ মামলা হিসাবে গ্রহণ করতে প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে একটি বেঞ্চ গঠনের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

দিদিকে ক্ষমা করতে পারবেন দাদা ?

মাননীয় মদন দা,

আপনি মন্ত্রী আছেন তবু দাদা বলতেই ভালো লাগছে। এতদিন জেল থুড়ি হাসপাতালে থেকে বাড়ি ফিরে কেমন লাগছে? কিন্তু দাদা, এই এগারো মাসেই অনেক কিছু বদলে গেছে। 'জামিন ওষুধ' যেমন আপনাকে নিমেষে সুস্থ করে দিয়েছে তেমনই বদলে দিয়েছে দিদিকে। মাত্র এগারো মাস সময়। তার মধ্যেই বদলে গেল প্রতিক্রিয়া। আপনি জামিন পেতে প্রথমদিন কোনো প্রতিক্রিয়াই দেননি আপনার আমার প্রিয় দিদি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু বলেছেন, "এটা আদালতের বিষয়। আমি কোনো মন্তব্য করব না।" অথচ এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আপনাকে সিবিআই গ্রেপ্তার করার পরের দিনই কলকাতা কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। ময়দানে মঞ্চ বেঁধে শুরু হয়েছিল অবস্থান। মিছিল হয়েছিল মদন মিত্রকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে। প্রাক্তন ও বর্তমান খেলোয়াড় ছাড়াও সেই মিছিলে ছিলেন একঝাঁক টলিউড তারকা। সেই মিছিলের পুরভাগে ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের প্রবল সমালোচনা সত্ত্বেও মিছিল এবং অবস্থানের সিদ্ধান্ত থেকে এক পাও পিছু হটেননি বাংলার 'অগ্নিকন্যা'। শ্যাম থাপা, মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বসুর মতো এক ঝাঁক প্রাক্তন ফুটবল তারকা। দীপেন্দু বিশ্বাসের মতো বর্তমান তারকাও। সেই মিছিলে এবং অবস্থানে রীতিমতো ফতোয়া জারি করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জড়ো করা হয়েছিল অজস্র ক্লাবের সদস্য এবং কর্মকর্তাদের। তাঁরই নির্দেশে রাজ্যের আইনমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং বিধাননগরের তৎকালীন পুরপ্রধান কৃষ্ণা চক্রবর্তী সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে অবস্থানও করেছিলেন।

ভাবা যায়! বহুকালের সতীর্থ আপনার প্রতি প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় কোনো সহানুভূতি ফুটে ওঠেনি। কিন্তু কেন মমতা

হঠাৎ এইভাবে বদলে গেলেন? সারদাকাণ্ডে সাংবাদিক-সাংসদ কুণাল ঘোষকে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ গ্রেপ্তার করার পরে ঠিক এই ভাবেই কিন্তু মমতা বলেছিলেন, "আইন আইনের পথেই চলবে।"

গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে অগুনতি বার মদন মিত্রর আইনজীবীরা আদালতে তাঁর জামিনের আবেদন করেছেন। প্রতিবারই সিবিআইয়ের আইনজীবীরা যে সব যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে জোরদার যুক্তি ছিল আপনি মদন মিত্র এখনও মন্ত্রী, তিনি প্রভাবশালী। আপনার আইনজীবীরা বার বারই আদালতে বলেছেন, মন্ত্রিত্ব ছাড়তে রাজি আছেন। কিন্তু বিরোধীদের বহু সমালোচনা সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু আপনাকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরাননি। যে মন্ত্রিত্ব আপনার গলার কাঁটা হয়ে ঝুলে ছিল, সেই মন্ত্রিত্বেই তিনি তাঁকে রেখে দিলেন কেন? তাহলে কি মমতা চাননি আপনি জামিন পান?

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সৃঞ্জয় বসু সারদা মামলায় জামিন পাওয়ার পরে তৃণমূলের প্রাথমিক সদস্যপদ পর্যন্ত ত্যাগ করেন। এমনকী তাঁর প্রেস থেকে তৃণমূলের মুখপত্র মুদ্রণের কাজও বন্ধ করে দেন। এর আগে সিবিআইয়ের জেরার মুখোমুখি হওয়ার পরই দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ান মুকুল রায়। একের পর এক দলের বৈঠক এড়িয়ে যাওয়ায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এবার তাই আপনার জামিনের খবরেও সিঁদুরে মেঘ দেখছে তৃণমূল এবং তৃণমূলনেত্রী। শোনা যাচ্ছে, মুকুল মিত্র'র নতুন দল রাজ্যে কী প্রভাব ফেলবে, সেদিকেও তাকিয়ে রয়েছেন আপনি।

কামারহাটি বিধানসভায় তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এড়িয়ে গিয়ে আপনাকেই তাঁদের নেতা হিসেবে প্রচার করতে থাকেন। মদন মিত্রকে কেন জামিন দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে পোস্টার পড়তে থাকে কামারহাটি এলাকায়। তৃণমূলের ব্রিগেড সমাবেশে আপনার কাট-আউট নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশের জন্য তৃণমূলের এক কর্মীকে ভর্ৎসনাও করেছেন দিদি। আপনার জামিনের জন্যই বা কী উদ্যোগ নিয়েছেন দিদি? কপিল সিব্বালকে আনার জন্য স্ত্রীর গয়না বিক্রি করতে হয় বলেও শুনেছি। আপনি কি দিদিকে ক্ষমা করতে পারবেন?

— **সুন্দর মৌলিক**

গোমাংস ভক্ষণ এবং পুরস্কার ফেরত দেওয়ার নাটক আদতে রাজনীতির নোংরা খেলা

গূঢ় পুরুষের

কলম

গোমাংস ভক্ষণ এবং হিন্দুদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদে এক শ্রেণীর দালাল বুদ্ধিজীবীর প্রতিবাদ এবং জাতীয় পুরস্কার ফেরত দেওয়ার হিড়িক চলছে। আর এতে ইন্ধন জোগাচ্ছে দেশের সংবাদমাধ্যম। এটা যে নিছকই দেখনদারি প্রচার তা বুঝতে অসুবিধা নেই। কিন্তু কেন এই পুরস্কার ফেরত দেওয়ার হিড়িক ঠিক বিহারের নির্বাচনের মুখে শুরু করা হয়েছে সেটা দেশের মানুষের ভেবে দেখা দরকার। আরও একটা বিষয় ভাবা দরকার তা হচ্ছে এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কারা। এদের পরিচয়টা জানলেই সমস্ত বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এরা সকলেই বামপন্থী রাজনীতির শরিক এবং বিগত লোকসভার নির্বাচনের আগে একযোগে লিখিত বিবৃতি দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি-কে পরাস্ত করতে। কিন্তু তাঁদের আবেদনকে খারিজ করে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকরা বিজেপির ঝুলিতেই তাঁদের ভোটটি দেন। এরপর থেকেই তাঁরা সুযোগ খুঁজছিলেন নরেন্দ্র মোদীকে কলুষিত করার। পুরস্কার ফেরত দেওয়া এবং বিবৃতির লড়াই আদতে রাজনীতির পাশা খেলা।

এই বিষয়টি নিয়ে দেশের অন্যান্য সমাজসেবী, রাজনীতিক, শিল্পী তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। তাই আমার কথা নয়, তাঁদের কথাই আজ বলবো। দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পট্টবর্ধন-সহ ১২ জন চিত্র পরিচালকের জাতীয় পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার কড়া সমালোচনা করেছেন অভিনেতা অনুপম খের। তাঁকে সমর্থন করেছেন আর এক জাতীয় পুরস্কার বিজেতা মধুর ভাণ্ডারকর। তাঁরা বলেছেন, পুরস্কার ফেরত দিতে চাওয়া এইসব চিত্রনির্মাতারা প্রাক্তন কংগ্রেস সরকারের সুবিধাভোগী ছিলেন। এঁরা কখনই চাননি নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হোন। জাতীয় পুরস্কার ফেরত দিয়ে এঁরা দেশকেই অপমান করেছেন। পুরস্কার সরকারের নয়, দেশের। এই ‘অ্যাওয়ার্ড ওয়াপসি গ্যাং’ শুধু সরকারকে অপমান করেনি, অপমান করেছে বিচারকমণ্ডলী ও তাদের সিনেমার দর্শকদের। মধুর ভাণ্ডারকরের কথায়, জাতীয় পুরস্কার কোনো ব্যক্তিকে তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসাবে দেওয়া হয়। কাজেই জাতীয় পুরস্কার ফেরত দেওয়ার অর্থ যে বিচারকরা সেটিকে নির্বাচন করেছিলেন তাঁদের সবার এবং স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকেও অপমান করা। অভিনেত্রী বিদ্যা বালান বলেছেন, এই সম্মান আমায় দেশ দিয়েছে। তাই এই পুরস্কার আমি কোনোদিনই ফেরত দেওয়ার কথা ভাবতে পারি না।

পদ্মবিভূষণ ও ইসরোর প্রাক্তন কর্ণধার বিজ্ঞানী জি মাধবন নায়ারের বক্তব্য, লেখক ও বিজ্ঞানীদের জাতীয় পুরস্কার ফেরত দেওয়াটা শুধু দেখনদারি ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারত অত্যন্ত বড় দেশ। তাই কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করাটা অনুচিত। তাঁর অনেক কাজ রয়েছে। তাঁর পক্ষে সব কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোটা সম্ভব নয়। মাধবন বলেছেন, জাতীয় পুরস্কার বা সম্মান কোনো ব্যক্তির সারা জীবনের কাজের স্বীকৃতি হিসাবে দেওয়া হয়। পুরস্কার ফেরত দেওয়া দেশকে ছোট করে। মনে হয়, রাজনৈতিক স্বার্থেই এইসব চলছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, বিজেপি বিরোধীরাই শুধু পুরস্কার ফেরাচ্ছেন। তাঁদের সব প্রতিবাদই তৈরি করা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, কংগ্রেসের আমলে দাঙ্গা হয়েছে। মোদীজীর সরকারের আমলে দেশে একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। কোথায় অসহিষ্ণুতা? একটি জরুরি কথা বলেছেন উমা ভারতী। তিনি বলেছেন, বামপন্থী লেখক কালবুর্গির মৃত্যু ও দাদরির ঘটনা যে দুই রাজ্যে ঘটেছে সেই দুই রাজ্য অবিজেপি শাসিত রাজ্য। তা সত্ত্বেও অসহিষ্ণুতার ইস্যু তুলে মোদীকে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। দুনিয়ার সামনে দেশের ভাবমূর্তি খারাপ করতে পরিকল্পিতভাবে পুরস্কার ফেরত দেওয়ার নাটক করা হচ্ছে।

কলকাতার ধর্মতলায় কিছু বাম ও তৃণমূল সমর্থক প্রকাশ্য রাজপথে গোমাংস খাওয়ার উৎসব পালন করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে হিন্দুদের মুসলমানি খাদ্যাভ্যাস শিক্ষা দেওয়া। ভাল কথা। কিন্তু ঠিক এইভাবেই প্রকাশ্য রাজপথে মুসলমান সম্প্রদায়কে শুয়োরের মাংস খাওয়ার শিক্ষা কি তারা দিতে পারবে? মনে হয় না। একটা কথা ভুললে চলবে না, ভারতের প্রতিটি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানের নিজস্ব ধর্মীয় অনুশাসন মেনেই খাদ্যাভ্যাস তৈরি হয়েছে। শুয়োরের মাংস যদি মুসলমানের কাছে হারাম হয় তবে গোমাংস হিন্দুর কাছে হারাম। মুসলমান সম্প্রদায়ের উচিত হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে সম্মান দেওয়া। অবাক হতে হয় যখন দেখি গোমাংস খাওয়ার প্রতিযোগিতায় শুধুই বামমার্গী হিন্দুরাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মুসলমানরা নয়। তাই বলছি, গোমাংস ভক্ষণ এবং পুরস্কার ফেরত দেওয়ার নাটক আদতে রাজনীতির নোংরা খেলা। ■

ধর্মীয় জনগণনা ২০১১

পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ হবার পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে

মোহিত রায়

সারা দেশের ধর্মীয় জনগণনার সর্বশেষ ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশিত হলো মাত্র মাস দুয়েক আগে। এই গণনা হয়েছিল ২০১১ সালে সাধারণ জনগণনার সময়েই। তবে সব সময়েই কেন্দ্রীয় সরকার (মূলত কংগ্রেসি সরকার) দশ বছর অন্তর করা ধর্মীয় জনগণনার ফলাফল প্রকাশ করতে অনেক দেরি করে। মনমোহন-সোনিয়ার কংগ্রেস সরকার ২০১৪ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকলেও এই তথ্য তারা প্রকাশ করেনি। এর একটাই কারণ যে প্রতিটি জনগণনার পরই দেখা যায় কীভাবে ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সরকার এটিকে আড়াল করতে যতটা সম্ভব দেরি করা যায় তার চেষ্টা করে। সরকারি এই বিলম্বের ব্যাপারে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা একেবারে নীরব থাকেন। তার কারণ অবশ্য এখন শিশুও জানে যে এই ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে ইসলাম-সংবেদনশীল কোনোকিছু ঘাঁটাঘাঁটি একেবারেই হারাম কর্ম। ফলে ২০১১-র ধর্মীয় জনগণনার ফলাফল বেরুলো অনেক দেরি করে, এমনকী নতুন মোদী সরকার আসারও এক বছর পরে। এই ধর্মীয় জনগণনায় বয়সভিত্তিক ফলাফল এখনো প্রকাশিত নয় যা খুব দরকারি।

জনগণনা নিয়ে আলোচনায় যাবার আগে এর প্রেক্ষাপটে দু' একটি কথা বলে রাখা জরুরি। গত প্রায় ৭০ বছরের স্বাধীন ভারতে ধর্মীয় জনসংখ্যা নিয়ে আলোচনায় এমন একটা ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে মুসলমানরা জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ না হওয়া পর্যন্ত তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাকবে এবং ততদিন তাদের তোয়াজ করে যেতে হবে। আমাদের মনে রাখা উচিত ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবার সময় মুসলমানরা ছিল জনসংখ্যার মাত্র ২৪ শতাংশ। কিন্তু তারা দেশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে আলাদা করে পাকিস্তান গঠন করতে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' দেশের কোনো কোনো অংশে সংখ্যাগুরু হয়ে তা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন বা সেখানে শরিয়তি শাসন কায়েম করতে পারে। কেরল, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের কিছু অংশে সেই অবস্থা চালু হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, অসমের মতো রাজ্যে

যেখানে মুসলমানরা ৩০ শতাংশের কম বেশি সেখানেও তাদের সংখ্যালঘু বলে তোয়াজ করা হয়, এমনকী বিজেপি দলও সেখানে সংখ্যালঘু সেল চালু রাখে। দুঃখের ব্যাপার হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতারাও এই বিষয়টি বুঝতে চান না, তাঁরা কেবল এক সর্বভারতীয় চিত্র দেখে সামান্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

কেন পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

জনসংখ্যার ধর্মীয় বিন্যাস যে পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণ সমস্যার সঙ্গে যুক্ত এই কথাটি প্রথমে ভাল করে বুঝতে হবে। দিল্লী থেকে প্রেরিত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতারা এই বিষয়টি ঠিক বোঝেন না বলেই মনে হয়েছে। তাঁরা এখানে এসে শুধু 'বিকাশ'-এর কথা বলেন ও তাঁদের অনুগ্রহ পেয়ে নিজেদের অবস্থান জোরদার করতে রাজ্যের নেতারাও জনসংখ্যার ধর্মীয় বিন্যাস নিয়ে কখনো কোনো আলোচনা করেন না। এই রাজ্যের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম বিষয় হওয়া উচিত রাজ্যের জনসংখ্যার ধর্মীয় বিন্যাস। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গ তৈরিই হয়েছে জনসংখ্যার ধর্মীয় বিন্যাসের ভিত্তিতে। ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী অখণ্ড বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) মুসলমানরা ছিল ৫৬ শতাংশ আর হিন্দুরা ৪৪ শতাংশ। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভা ভেঙে তৈরি হলো পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। দুই আইনসভাতেই অমুসলমান সদস্যরা বাংলাভাগের পক্ষে ও পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠন সুনিশ্চিত করেন। হিন্দু বাঙালি তাঁর নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ স্থাপন করেছে। দেশভাগের সাময়িক ঘটনাবলীর পর ১৯৫১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা হল ৭৮.৫ শতাংশ, মুসলমানরা ২০ শতাংশ। এই বিন্যাস নষ্ট হওয়া মানেই পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ভিত্তিতেই কুঠারাঘাত। এবার আমরা দেখব সেই কুঠারাঘাত চলছেই, বরং বাংলাদেশ গঠিত হবার পর তা আরো নির্মম হয়ে উঠেছে।

জনগণনা ২০১১

প্রথমেই বলে রাখা ভাল পশ্চিমবঙ্গের জনগণনার জনসংখ্যা সঠিক কিনা তা বলা মুশকিল। কথাটা এজন্যই বলছি যে পশ্চিমবঙ্গে এক বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। এটা সবাই জানেন কিন্তু 'সেকুলারিজমের' গুঁতোয় কেউ এটা নিয়ে কোনো কথা বলেন না রাজনীতিবিদ থেকে অ্যাকাডেমিকরা। ফলে এই অনুপ্রবেশকারীরা সবাই জনগণনার আওতায় এসেছে কিনা তা প্রশ্নযোগ্য। না এলে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত জনসংখ্যা আরো বেশি হবে এবং ধর্মীয় জনবিন্যাসটিরও প্রকৃত চিত্র জানা যাবে না।

এবার জনগণনার মূল তথ্যটি সামনে রাখা যাক। *(সারণী-১ দ্রষ্টব্য)*

সারণী-১

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনবিন্যাস ২০০১-১১ (শতাংশে)

সাল	হিন্দু	মুসলমান	মোট জনসংখ্যা
২০১১	৬৪৩৮৫৫৪৬	২৪৬৫৪৮২৫	৯১২৭৬১১৫
২০১১	৭০.৫৪	২৭	
২০০১	৫৮১০৪৮৩৫	২০২৪০৫৪৩	৮০১৭৬১৯৭
২০০১	৭২.৪৮	২৫.২৫	
বৃদ্ধির হার	১০.৮	২৪.৭	

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত গত দশকেও কমে গেছে এবং মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বেড়েই চলেছে। ২০০১ সাল থেকে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত কমে গেছে ১.৯৪ শতাংশ, মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৭৫ শতাংশ। হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত নেমে এসেছে ৭০ শতাংশে আর মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭ শতাংশ। যদিও এই লেখক মনে করেন মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত আরো বেশিই হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৪.৭ শতাংশ যা হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের (১০.৮ শতাংশ) দ্বিগুণেরও বেশি।

এবার যদি জেলাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে মুসলমানরা সব জেলাতেই ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার পর কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলা ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাও মুসলমানরা ছিল ৫৫ শতাংশ তা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬ শতাংশে। স্বাধীনতার পর মালদহ জেলা ছিল যথেষ্ট হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ৬৩ শতাংশ, সেই জেলায় এখন হিন্দুরা সংখ্যালঘু, মুসলমানরা ৫১.১ শতাংশ। ২০০১ সালে উত্তর দিনাজপুর জেলা ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ, ২০১১ সালে তা এখন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। এভাবেই ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের একেকটি জেলা সম্পূর্ণ পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাচ্ছে। *(সারণী-২ দ্রষ্টব্য)*

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৭৩ শতাংশ হিন্দু কমে হয়েছে ৬৩ শতাংশ। গ্রামাঞ্চল ও আধা শহরে মুসলমানদের দাপটে সন্ত্রস্ত হিন্দুরা। কলকাতার কাছেই মুসলমানপ্রধান মল্লিকপুর অঞ্চলে স্থানীয় কলেজের হিন্দু ছাত্রীদের নির্বিচারে শালীনতা নষ্ট করার সাহস দেখিয়েছে। ক্যানিংয়ের নলিয়াখালিতে হিন্দু গ্রামের শ' দুয়েক ঘরবাড়ি জ্বালানোও আর কঠিন কাজ নয়। এভাবেই হাওড়ার মুসলমান জনসংখ্যা ১৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৬ শতাংশ হয়েছে। ফলে হাওড়ার কিছু অঞ্চল এখন পুরো মুসলমান নিয়ন্ত্রণেই চলে, হিন্দুরা থাকে জিম্মি হয়ে।

১৯৫১-২০১১ ইসলামি প্রসার

পূর্বপাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ থেকে হিন্দু উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত অব্যাহত

সারণী-২

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে ধর্মীয় জনবিন্যাসের পরিবর্তন (শতাংশে)

		১৯৫১	২০০১	২০১১	পরিবর্তন ২০০১-১১	পরিবর্তন ১৯৫১-২০১১
পশ্চিমবঙ্গ	হিন্দু	৭৮.৪৫	৭২.৪৭	৭০.৫৪	-১.৯৩	-৭.৯১
	মুসলমান	১৯.৮৫	২৫.২৫	২৭	১.৭৫	৭.১৫
দার্জিলিং	হিন্দু	৮১.৭১	৭৬.৯২	৭৪	-২.৯২	-৭.৭১
	মুসলমান	১.১৪	৫.৩১	৫.৭	০.৩৯	৪.৫৬
জলপাইগুড়ি	হিন্দু	৮৪.১৮	৮৩.৩	৮১.৫	-১.৮	-২.৬৮
	মুসলমান	৯.৭৪	১০.৮৫	১১.৫১	০.৬৬	১.৭৭
কুচবিহার	হিন্দু	৭০.৯০	৭৫.৫০	৭৪.০৬	-১.৪৪	৩.১৬
	মুসলমান	২৮.৯৪	২৪.২৪	২৫.৫৪	১.৩	-৩.৪
উত্তর দিনাজপুর	হিন্দু		৫১.৭২	৪৯.৩১	-২.৪১	
	মুসলমান		৪৭.৩৬	৪৯.৯২	২.৫৬	
দক্ষিণ দিনাজপুর	হিন্দু		৭৪.০১	৭৩.৫৪	-০.৪৭	
	মুসলমান		২৪.০২	২৪.৬২	০.৬	
মালদহ	হিন্দু	৬২.৯২	৪৯.২৮	৪৭.৯৯	-১.২৯	-১৪.৯৩
	মুসলমান	৩৬.৯৭	৪৯.৭২	৫১.২৭	১.৫৫	১৪.৩
মুর্শিদাবাদ	হিন্দু	৪৪.৬০	৩৫.৯২	৩৩.২	-২.৭২	-১১.৪
	মুসলমান	৫৫.২৪	৬৩.৬৭	৬৬.২৪	২.৫৭	১১
বীরভূম	হিন্দু	৭২.৬০	৬৪.৬৯	৬২.২৮	-২.৪১	-১০.৩২
	মুসলমান	২৬.৮৬	৩৫.০৮	৩৭.০৬	১.৯৮	১০.২
বর্ধমান	হিন্দু	৮৩.৭৩	৭৮.৮৯	৭৭.৮৫	-১.০৪	-৫.৮৮
	মুসলমান	১৫.৬০	১৯.৭৮	২০.৭৩	০.৯৫	৫.১৩
নদীয়া	হিন্দু	৭৭.০৩	৭৩.৭৫	৭২.১৫	-১.৬	-৪.৮৮
	মুসলমান	২২.৩৬	২৫.৪১	২৬.৭৬	১.৩৫	৪.৪
উত্তর ২৪ পরগনা*	হিন্দু	৭৭.২৬*	৭৫.২৩	৭৩.৪৫	-১.৭৮	-৩.৮১
	মুসলমান	২২.৪৩*	২৪.২২	২৫.৮২	১.৬	৩.৩৯
দক্ষিণ ২৪ পরগনা*	হিন্দু	৭২.৯৬*	৬৫.৮৬	৬৩.১৬	-২.৭	-৯.৮
	মুসলমান	২৬.০৫*	৩৩.২৪	৩৫.৫৭	২.৩৩	৯.৫২
হুগলী	হিন্দু	৮৬.৫২	৮৩.৬৩	৮২.৮৮	-০.৭৫	-৩.৬৪
	মুসলমান	১৩.২৭	১৫.১৪	১৫.৭৬	০.৬২	২.৪৯
বাঁকুড়া	হিন্দু	৯১.১৬	৮৪.৩৫	৮৪.৩৪	-০.০১	-৬.৮২
	মুসলমান	৪.৪০	৭.৫১	৮.০৭	০.৫৬	৩.৬৭
পুরুলিয়া*	হিন্দু	৯৩.১৩*	৮৩.৪২	৮০.১	-৩.৩২	-১৩.০৩
	মুসলমান	৫.৯৯*	৭.১২	৭.৭৫	০.৬৩	১.৭৬
মেদিনীপুর*	হিন্দু	৯১.৭৮	৮৫.৫৮	৮৫.৩৯	-০.১৯	-৬.৩৯
	মুসলমান	৭.১৭	১১.৩৩	১২.৩৯	১.০৬	৫.২২
হাওড়া	হিন্দু	৮৩.৪৫	৭৪.৯৮	৭২.৯	-২.০৮	-১০.৫৫
	মুসলমান	১৬.২২	২৪.৪৪	২৬.২	১.৭৬	৯.৯৮
কলকাতা	হিন্দু	৮৩.৪১	৭৭.৬৮	৭৬.৫	-১.১৮	-৬.৯১
	মুসলমান	১২.০০	২০.২৭	২০.৬	০.৩৩	৮.৬
পশ্চিম মেদিনীপুর	হিন্দু			৮৫.৫১	৮৫.৫১	
	মুসলমান			১০.৪৯	১০.৪৯	
পূর্ব মেদিনীপুর	হিন্দু			৮৫.২৪	৮৫.২৪	
	মুসলমান			১৪.৫৯	১৪.৫৯	

* পুরুলিয়ার তথ্য ১৯৬১-র, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার তথ্য ১৯৭১ সালের, মেদিনীপুরের তথ্য পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর একত্রে।

রইলো, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত তবু বেড়েই চলল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক বছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংসের কাজটি শুরু করে দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। ১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি দুই দেশের মধ্যে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন যেখানে "দুই দেশের সংখ্যালঘুদের সমানাধিকারের ভরসা দেওয়া হয়"। এই চুক্তিতে দুই দেশের সংখ্যালঘুদের "অবাধ গতিবিধি"র অধিকারের কথাও বলা হলো। এই চুক্তির কারণেই তৎকালীন শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পদত্যাগ করেন। ১৯৫০ সালের ১৪ এপ্রিল সংসদে তিনি বলেন,— "ব্যাপক সংখ্যায় হিন্দুরা আসতেই থাকবেন, আর যাঁরা আসবে তাঁরা ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না। অন্যদিকে যে সমস্ত মুসলমান চলে গিয়েছিল তাঁরা ফিরে আসবেন এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস চুক্তিটির একতরফা রূপায়ণে মুসলমানেরা ভারত ছেড়ে যাবেন না। আমাদের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং আমাদের দেশের মধ্যেকার সংঘাত আরো বেড়ে যাবে।" লক্ষ্য করুন যে ১৯৬১ সালের

সারণী-৩

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনবিন্যাস ১৯৫১-২০১১

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
হিন্দু	৭৮.৪৫	৭৮.৮০	৭৮.১১	৭৬.৯৬	৭৪.৭২	৭২.৪৭	৭০.৫৪
মুসলমান	১৯.৮৫	২০.০০	২০.৪৬	২১.৫১	২৩.৬১	২৫.২৫	২৭

সারণী-৪

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (শতাংশে)

	১৯৫১-১৯৬১	১৯৬১-১৯৭১	১৯৭১-১৯৮১	১৯৮১-১৯৯১	১৯৯১-২০০১	২০০১-২০১১	১৯৫১-২০১১
হিন্দু	৩৩.৩	২৫.৭৫	২১.৩৭	২১.০৯	১৪.২৩	১০.৮	৩০৯.৭৫
মুসলমান	৩৩.৭	২৯.৭৬	২৯.৫৫	৩৬.৮৯	২৫.৯১	২৪.৭	৪৮৫.৪১

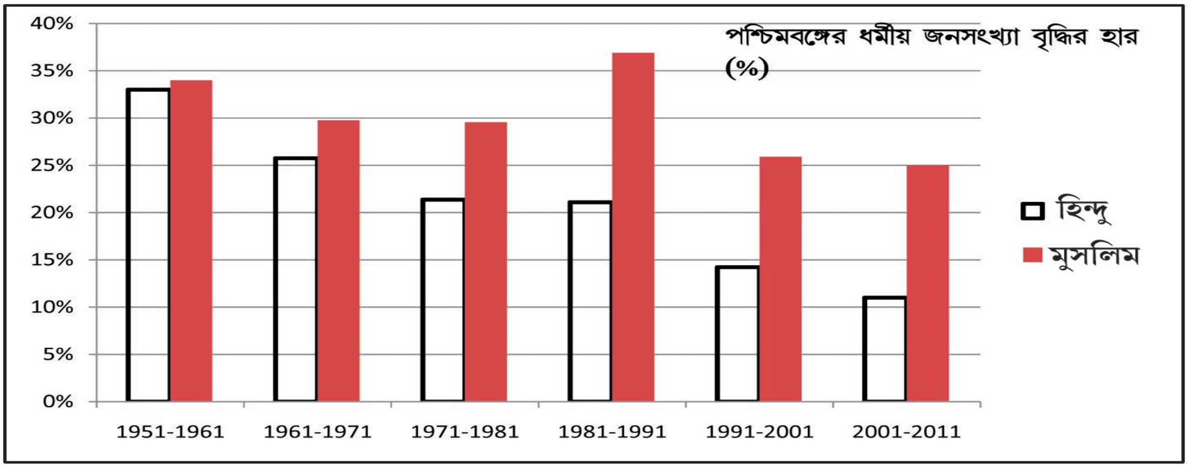

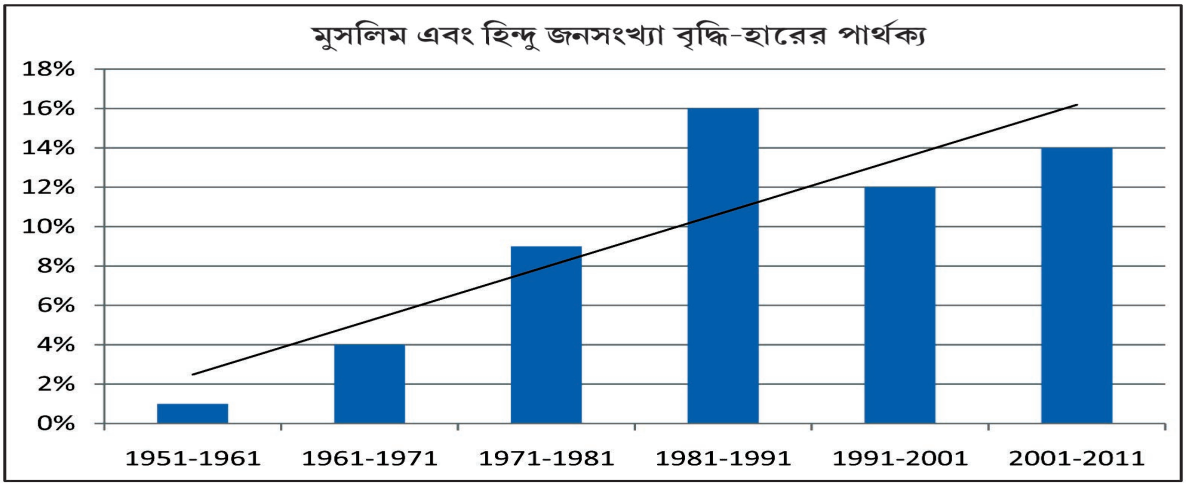

জনগণনায় খুব সামান্য হলেও মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বেড়েছে। আরো লক্ষ্য করুন মুসলমান জনসংখ্যার অসম্ভব বাড়বাড়ন্ত ঘটলো ১৯৮১-র পর থেকে। ১৯৮১ থেকে ২০১১-বামপন্থীদের জমানায়। ১৯৫১ থেকে ১৯৮১— এই ৩০ বছরে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৬৬ শতাংশ আর ১৯৮১ থেকে ২০১১— এই ৩০ বছরে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় সাড়ে তিন গুণ-৫.৪৯ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ করবার প্রাথমিক কাজটি করে দিয়েছে বামপন্থীরা। এখন সেই মাঠে ফসল ফলাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইমামরা। ১৯.৮৫ শতাংশ মুসলমান এখন ২৭ শতাংশে বলীয়ান যদিও প্রকৃত সংখ্যাটি আরো বেশি বলেই মনে হয়। *(সারণী-৩ দ্রষ্টব্য)*

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

১৯৫১-'৬১-তে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি শ্যামাপ্রসাদের সতর্কবাণীর সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। পূর্বপাকিস্তান থেকে কাতারে কাতারে হিন্দু উদ্বাস্তুর আগমনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩৩.৩ শতাংশ, কিন্তু আশ্চর্য, মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল আরো বেশি ৩৩.৭ শতাংশ! কারণ নেহরু-লিয়াকত চুক্তির সুযোগে পূর্বপাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানদের বড় অংশ ফিরে আসে। এই শুরু পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ভিতের অবক্ষয়। মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সবচেয়ে ভয়ানক সময়টি চলে কমরেড জ্যোতি বসুর আমলে। মনে রাখতে হবে, পূর্বপাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু আসা কখনও বন্ধ হয়নি, তবু হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমেছে এবং ১৯৮১-৯১-তেও তা কমেছে। কিন্তু ১৯৮১-৯১-তে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার না কমে বরং আরো বেড়ে গেল, ২৯.৫৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হলো ৩৬.৮৯ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে যদি জনসংখ্যা ও জনবিন্যাস নিয়ে গবেষণা ও অধ্যয়নে বিন্দুমাত্র সততা থাকত, তবে ১৯৯১-এর জনগণনার ফল প্রকাশের পর এই বিষয়টিই গবেষণার অত্যন্ত জরুরি বিষয় হোত। এই বিষয়টি হয়ে উঠত রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, পরিবেশ পরিকল্পনা এমনকী নির্বাচনী বিষয়। না, কিছুই হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের সচেতন বুদ্ধিজীবীরা নীরব

সারণী-৫

হিন্দুদের থেকে মুসলমান বৃদ্ধির হার কতটা বেশি (শতাংশে)

১৯৫১-১৯৬১	১৯৬১-১৯৭১	১৯৭১-১৯৮১	১৯৮১-১৯৯১	১৯৯১-২০০১	২০০১-২০১১	১৯৫১-২০১১
০.৪	৪.০১	৮.১৮	১৫.৮	১১.৬৮	১৩.৯	১৭৫.৬৬

সারণী-৬

বাংলাদেশে হিন্দু জনবিন্যাসের পরিবর্তন ১৯৫১-২০১১

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
হিন্দু	২২.০	১৮.৫	১৩.৫	১২.১	১০.৫	৯.২	৮.৭

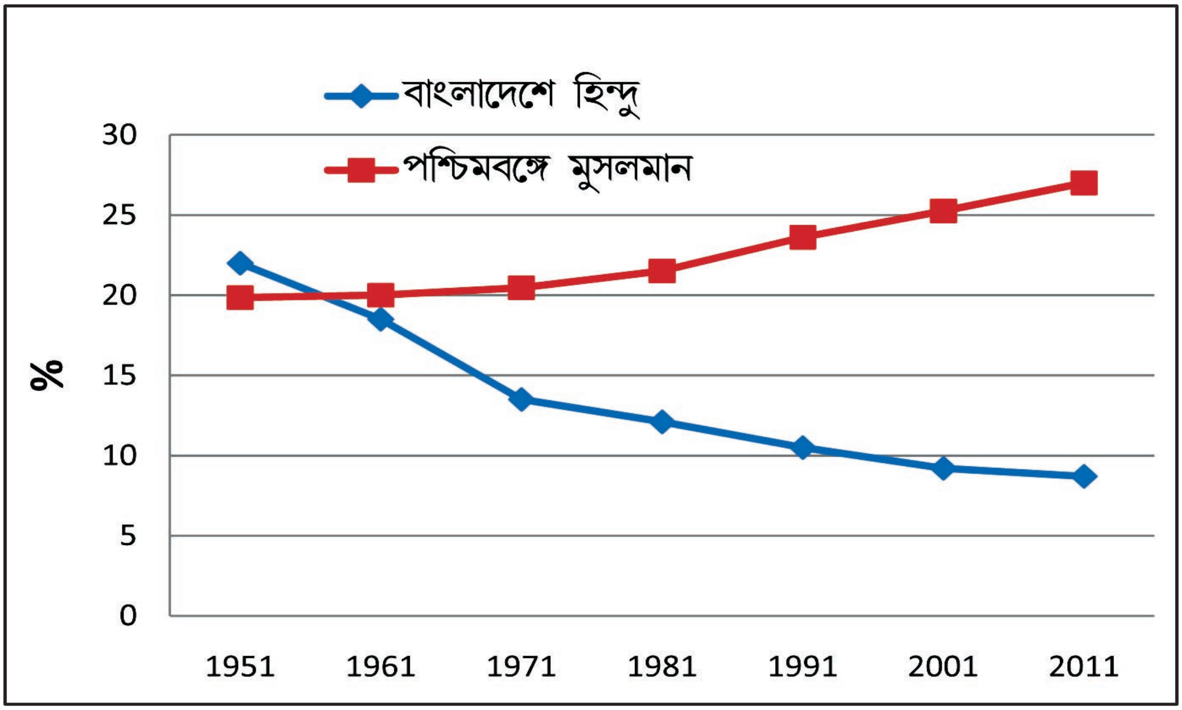

থেকেছেন। একমাত্র একদা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও ফজলুল হকের পরিবারে বিবাহ করা অধ্যাপক ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মুসলমান অনুপ্রবেশ নিয়ে একটি পুস্তিকা লেখেন। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকাটি কোনো কুলীন প্রকাশক পায়নি এবং যথারীতি পুস্তিকাটি সি পি আই এমের পত্রিকায় যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছিল। *(সারণী-৪ দ্রষ্টব্য)*

আরো লক্ষ্য করুন, হিন্দু মুসলমান বৃদ্ধির হারের ব্যবধান কীভাবে দশকের পর দশক বেড়েই চলেছে। ২০০১ থেকে ২০১১-তে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে ৩.৪৩ শতাংশ, মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে মাত্র ১.২১ শতাংশ। এক কথায় বলা যায় যে আমরা ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ গঠন করেছিলাম যেখানে অমুসলমান বাঙালি নিশ্চিন্তে গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করবে। আজ ২০১১ সালে এই পশ্চিমবঙ্গ অনেকটাই তুলে দিয়েছি মুসলমানদের হাতে যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বটাই আজ ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। *(সারণী-৫ দ্রষ্টব্য)*

সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙালিরা কেমন আছেন?

কেউ কেউ বলেন আহা সংখ্যালঘুরা একটু জনসংখ্যা বেশি বৃদ্ধি করে, কেউ বলেন ওরা গরিব তাই! এবার দেখি মুসলমান শাসিত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙালিরা যাদের বেশিরভাগ গরিব তাঁরা কেমন আছেন? *(সারণী-৬ দ্রষ্টব্য)*

অর্থাৎ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫১ সালের ২০ শতাংশ মুসলমান গায়েগতরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১-তে হয়েছেন ২৭ শতাংশ। আর মুসলমান বাংলাদেশে ১৯৫১ সালের ২২ শতাংশ হিন্দু কমতে কমতে ২০১১-তে হয়েছেন ৮.৭ শতাংশ। এই যদি চলতে থাকে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ হওয়া কে ঠেকাবে?

স্বস্তিকার অভিমত

আমাদের প্রধান কাজ হবে

১. ধর্মীয় জনবিন্যাসের এই পরিবর্তন ও তার ভয়াবহ পরিণামের বিবরণ নিয়ে সারা রাজ্যে প্রচারাভিযান শুরু করা।

২. আগামী নির্বাচনে ধর্মীয় জনবিন্যাসের এই পরিবর্তনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরা।

৩. পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় জনবিন্যাসের এই পরিবর্তন ও তার পরিণামকে রোধ করতে বিভিন্ন সাংবিধানিক ও আইনি পথের জন্য আলোচনা শুরু করা।

iitrade
Institute of International Trade

COURSES OFFERED
Bachelors of Business Administration (H)
Post Graduate programme in Management
International Trade Management
Banking & Finance

AFFILIATIONS
WEST BENGAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Utech
NSE

Campus: EN – 27, Salt Lake City; Sector 5, Kolkata – 700 091
Regd. Office: 6, Waterloo Street; Suite # 504, Kolkata – 700 069
Phone: 033-3056-6049 | Email: info@iitrade.ac.in | Web: www.iitrade.ac.in

শীতঘুমে আচ্ছন্নদের প্রতি

অনসূয়া চন্দ্র

গত ২৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ধর্মের ভিত্তিতে জনগণনার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ২০০১ থেকে ২০১১ এই দশ বছরে দেশে মোট জনসংখ্যায় হিন্দুদের অংশ ০.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তার পাশাপাশি শিখ ও বৌদ্ধদের সংখ্যা যথাক্রমে ০.২ ও ০.১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। খৃষ্টান ও জৈনদের সংখ্যার তেমন তারতম্য দেখা না গেলেও পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় এই দশকে মুসলমানদের জনসংখ্যা ০.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যে পাঁচ রাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলি হলো, অসম, উত্তরাখণ্ড, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ ও গোয়া। পরিসংখ্যানটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদল তথাকথিত সেকুলার (একটি জনপ্রিয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে এরা সেকুলার নামে বিশেষিত) মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের নেতারা যেমন আছে, তেমনই রয়েছে একদল স্বঘোষিত ইন্টেলেকচুয়াল। এদের সবার বক্তব্য হলো নিকটবর্তী বিহার নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই নাকি বিজেপি এই রিপোর্ট পেশ করে রাজনৈতিক মেরুকরণের খেলায় মেতে উঠেছে। কেউ কেউ তো আবার এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখে হিন্দুদের উদ্বেগকে 'প্যারানোইয়া' (ভ্রম-বাতুলতা) বলেও চিহ্নিত করে ফেলছে। সবচেয়ে লজ্জার বিষয় হলো— এরা সবাই হিন্দু।

একথা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে এইসব ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী হিন্দুদের জন্যই এ দেশে হিন্দুবিদ্বেষীদের এত বাড়বাড়ন্ত। ভারত নাকি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র! অন্তত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইগুলোতে সেরকম লেখা থাকে বটে। বাস্তবিকই যদি ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হোত তবে মুসলমানদের একটা বড় অংশকে 'ওবিসি এ' বলে চিহ্নিত করে সংরক্ষণের আওতায় আনা হবে কেন? মুসলমান বলেই তারা অনগ্রসর— এই ধরনের Preassumption (আগাম ধারণা) যে কোনো সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে 'ওবিসি এ'-র জন্য পৃথক সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। হিন্দুরা কিন্তু ওই সংরক্ষিত আসনগুলোতে চাকুরি পায় না। অথচ মুসলমানরা অসংরক্ষিত আসনগুলিতে চাকুরির জন্য

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। তারপরও যদি তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি ফাঁকা পড়ে থাকে তবে সে দায় কি সরকারের না হিন্দুদের?

এদেশে কেন করা হয়? একটি বহুল প্রচলিত সংবাদপত্র সরকারি পরিসংখ্যান দেখিয়ে জানিয়েছে যে, একজন হিন্দু নাকি গড়ে প্রতি মাসে ১১২৫ টাকা ব্যয় করে যেখানে একজন মুসলমান নাকি ব্যয় করে মাত্র ৯৮০ টাকা। খুব দুঃখের কথা। কিন্তু প্রশ্ন হলো— কেউ ব্যয় কম করে বলে এটা সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেওয়া হয় কেন যে সে আর্থিক ভাবে বেশি দুর্বল। এমনও তো হতে পারে যে সে সঞ্চয় বেশি করে বলে ব্যয় কম করে। মুসলমানরা বেশি সঞ্চয়ী হয় না হিন্দুরা সেটা নিয়ে কেউ আজ পর্যন্ত সমীক্ষা করেছেন কি? বরং এই প্রতিবেদক ধিক্কার দিয়েছেন এ দেশের উন্নয়নের অসমতাকে। কারণ এখানে নাকি সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের সংখ্যা কার্যত হিসেবেই আসে না। উত্তরে বলি—

আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই এমন কয়েকটি অঞ্চল আছে যেখানে শুধুমাত্র মাদ্রাসার ছাত্রীদের মধ্যে বেছে বেছে সাইকেল বিতরণ করা হয়। যেন দারিদ্র্যের শিকার একমাত্র তারাই। উদাহরণ চাই? হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে খোঁজ নিতে পারেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই। আরো বিশদে খোঁজ নিলে জানতে পারবেন হাওড়ার কয়েকটি গ্রামীণ এলাকায় ইদানীং রাজ্যের শাসকদলের হিন্দু কর্মীরা তাদের রাজনৈতিক সমাবেশ ভঙ্গ হওয়ার পরে পরস্পরকে 'খোদা হাফেজ' বলে সম্বোধন

করা শুরু করেছেন।

মুসলমানদের বেশিরভাগই নাকি অপুষ্টির শিকার! দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং, কুলপি বা মগরাহাটে গিয়েছেন কখনো? যারা স্কুলে তাণ্ডব চালিয়ে দেবী সরস্বতী ও তাঁর বাহন হাঁসের মুণ্ড কেটে নিয়েছে, নোদাখালিতে নিরীহ হিন্দুদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের চেহারাটা দেখলে কিন্তু অপুষ্টি তত্ত্বটি বিশ্বাস হবে না। অথবা কামদুনিতে একটি প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের পা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবার শক্তি ধরে যে দুষ্কৃতীকারী তারাও কি অপুষ্টির শিকার? লালগোলা প্যাসেঞ্জারের ভিড়ে থিকথিক করা কামরা থেকে বেলডাঙা বা বহরমপুর স্টেশনে যারা নামে একবার তাদেরকে ভাল করে লক্ষ্য করবেন। মনে হবে তারা অপুষ্টির শিকার? হ্যাঁ, ব্যতিক্রম তো থাকতেই পারে। কিন্তু এটাও প্রশ্ন করি, হিন্দুরা কি কখনো রক্তাল্পতা বা রিকেট রোগে ভোগে না?

কাকে বলে ধর্মনিরপেক্ষতা? ব্যস্ততায় ঠাসা কাজের দিনগুলোতে এন্টালির মতো একটি জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা জুড়ে বসে মুসলমানরা নামাজ পড়ছে--- এ দৃশ্য কলকাতাতেই সম্ভব! অফিসযাত্রী বা ব্যবসায়ীদের কথা ছাড়ুন! অসুস্থ মানুষ পর্যন্ত তখন অ্যাম্বুলেন্সে আটকে খাবি খেতে থাকে। হিন্দুরা দেখে, অথচ প্রতিবাদ করে না। দুবাই-তে কিন্তু এ দৃশ্য আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। এমনকী ট্যাক্সি চালাতে চালাতে দমদম বিমানবন্দরের পথে হঠাৎ করে বিকেলের নামাজ পড়ার কারণ দেখিয়ে যাত্রীকে হতচকিত করে দিয়ে চালক মসজিদে ঢুকে পড়েছে, এমন ঘটনাও নাকি ঘটতে পারে এখানে! মেচেদা-দীঘা সড়কে তো বাস-লরি আটকে মহরমের চাঁদাও তোলা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলবল প্রায়ই হুগলীর ফুরপুরা শরিফ পর্যন্ত রেললাইন বিস্তার করতে যতটা সচেষ্ট হয়েছিলেন এই জেলারই কামারপুকুরকে রেল মানচিত্রে সংযোজিত করতে ততটা তৎপর হয়েছিলেন কি? তারকেশ্বরে পদপিষ্ট হয়ে পুণ্যার্থীরা আহত হলে খবরের কাগজগুলো হিন্দুদের 'হাজারটা দেবদেবী ও কুসংস্কার'-এর ধুয়ো তোলে। ঈশ্বর না করুন, ঘটনাটা যদি কোনো মসজিদে ঘটত, তারা কী বলতেন? রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে মিডিয়ার একটা বড় অংশ এই দোষে দোষী। 'মুস্তাফা মুস্তাফা' গান মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করছে। 'মুস্তাফা' শব্দ পালটে দিতে হবে। অথচ 'পিকে' ছবির বিরুদ্ধে হিন্দু সেন্টিমেন্টে আঘাত দেবার অভিযোগ উঠলে সেটাকে মাছি তাড়াবার মতো করে উড়িয়ে দিতে হবে। দোষী তো আমরা সবাই। কী করে 'জিন্দেগী' চ্যানেলে 'রক্ত নে কিয়া ক্যা হসীন সিতম্'- এর মতো ধারবাহিক প্রসারিত হয়? যেখানে দেখানো হচ্ছে লুধিয়ানাতে নাকি হিন্দু ও শিখরাই আগে দাঙ্গা শুরু করেছিল আর মুসলমানরা নাকি পড়ে পড়ে মার খাচ্ছিল। এই চ্যানেলের টি আর পি টা দেখে নেবেন। যেসব হিন্দু হাঁ করে এই ধারাবাহিকগুলো গিলে খায় ধিক্কার তাদেরও প্রাপ্য! কেন হিন্দুরা জোট বেঁধে ওই চ্যানেলটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাবে না?

হিন্দুরা পরীক্ষা দিতে যাবার আগে কপালে দইয়ের ফোঁটা দিলে সেটা কুসংস্কার। তারা হাতে লাল সুতো বাঁধলে ব্যঙ্গ। অথচ মুসলমানদের কালো সুতো বাঁধায় দোষ নেই। জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো একটি প্রাচীন বিদ্যাকে এখানে ভণ্ডামি বলা হয়। মুসলমান জ্যোতিষীকে এক্ষেত্রেও ছাড় দেওয়া হবে। ডায়মন্ড হারবার পেরিয়ে নামখানার দিকে যাবার সময় রাস্তার বাঁদিকে সাইনবোর্ডগুলো লক্ষ্য করবেন। 'এখানে জিনপরী তাড়ানোর ওষুধ দেওয়া হয়' মার্কা বহু বিজ্ঞাপন নজরে পড়বে। সরকারি বাসে ফেজ টুপি পরা ড্রাইভার দেখলে আপত্তি করা যাবে না। কিন্তু কেউ যদি নামাবলি গায়ে দিয়ে বাস চালাত দেখতেন কীভাবে লোকে তাকে ব্যঙ্গ করত। 'কেষ্ট করলে লীলা/আমরা করলে বিলা। কলি যুগের কেষ্ট রাধা ডিস্কো থেকে করে ডান্স'— একমাত্র নদীয়া জেলাতেই প্রতিবাদ করে সিনেমা থেকে এই গানটি বাদ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল! বাকি হিন্দুরা চুপ করেছিলেন কেন? ধিক্কার ওই ছবির নায়ক, গায়ক, সুরকার, গীতিকার, পরিচালক ও প্রযোজকদ্বয়কে। হিন্দু হয়ে এরকম ন্যক্কারজনক আচরণ করতে রুচিতে বাধল না। এটা কীরকম সেকুলারিজম? একজনের আরাধ্য মহান আর অন্যদের আরাধ্য ইয়ার্কি-ফাজলামির বস্তু?

লালুপ্রসাদ, মুলায়ম, মায়াবতী, মমতা, নীতিশ— মুসলমান তোষণে কেউ কম যান না। অথচ এরা নাকি হিন্দু! গুজরাট নিয়ে এদের সবার কত কান্না। গুজরাট দাঙ্গায় ক'জন মুসলমান মরেছিল? তাহলে মীরাট, নোয়াখালি, মুম্বই দাঙ্গায় কত হিন্দু মারা গিয়েছিল সেই হিসাবটা এদের মাথায় থাকে না কেন? কংগ্রেসের নেতারা তো অঙ্কে সবচেয়ে কাঁচা। ভারতের মাত্র ১.৭ শতাংশ মানুষ যে শ্রেণীভুক্ত সেই নিরীহ শিখদের মধ্যে ৮৪,০০০ জনকে তাঁরা পরপারে পাঠিয়ে দিলেন, অথচ সে বিষয়টা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ হলেন জৈনরা। লালু বা নীতিশকে এঁদের নিয়ে কোনো বাক্য খরচ করতে শোনা যায় না। আসলে এঁদের পাটীগণিতে ১৪.২ শতাংশ জিনিসটা ০.৪ শতাংশের চেয়েও মূল্যমানে কম! তাই তথাকথিত সংখ্যালঘু (?) ১৭.২২ কোটির দুঃখে তাঁদের চোখে জল ঝরে অথচ প্রকৃত সংখ্যালঘু ২.০৮ কোটি শিখ বা ০.৪৫ কোটি জৈনকে নিয়ে এঁরা ভাবেন না। এঁরা প্রমাণ করেই ছাড়বেন যে মুসলমানের সংখ্যা যতই বাড়ুক, আসলে নাকি তাদের বৃদ্ধি কমেছে।

জনৈক ইসলামদরদি লিখেছেন যে, সঙ্ঘ পরিবার নাকি ভারতকে 'হিন্দু পাকিস্তান' বানানোর স্বপ্ন দেখে। ভারতে মুসলমানরা কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে না, না হলে কতটা ক্ষতি হবে ধর্মনিরপেক্ষতার, এটাই তাঁর গবেষণার বিষয়। হ্যাঁ, মুসলমানদের বৃদ্ধি হোক। নির্বিচারে হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিক, লুঠপাট চালাক, মন্দির ভাঙুক, গো-হত্যা করুক, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিক, নারীর সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলুক— আপনারা চুপ করে থাকুন। পশ্চিমবঙ্গে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ দিনাজপুর ইতিমধ্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হিসাবে পরিগণিত। বাকি জেলাগুলোতেও হিন্দুরা ধীরে ধীরে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ুন। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে অচিরেই সংবিধান 'ধর্মইসলামপেক্ষতা' চালু হলো বলে। হিন্দুরা শীতঘুমে আচ্ছন্ন থাকুন। ■

চিঠিপত্র

সাহিত্যবিদ না রাজনীতিবিদ?

দাদরি কাণ্ড খবরের শিরোনামে। গোমাংস বাড়িতে রাখার দায়ে হিন্দু জনতা পিটিয়ে মেরেছে বাড়ির গেরস্থকে। এ তো অন্যায়। তার প্রতিবাদে সাহিত্যিক সমাজে পুরস্কার ফেরানোর হিড়িক। সাহিত্য বাস্তবের মাটিতে পা রেখেছে। তবে কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে :

(১) ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত দেশে ৪২০০ শ'র বেশি দাঙ্গা হয়েছে, তখন কোনো সাহিত্যবিদ তাদের সম্মান ফেরত দেওয়ার কথা ভাবেননি। কেন? (২) প্রতিবাদের মুখ নয়নতারা সেহগাল। তিনি তাঁর সাহিত্য সম্মান ফেরত দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি সেই সম্মানটি পেয়েছিলেন ১৯৮৬ সালে। তার ঠিক ২ বছর আগেই সারা দেশে নৃশংস ভাবে শিখদের হত্যা করা হয়েছে। তখন তিনি সাম্প্রদায়িকতার কথা চিন্তা করেননি, কারণ তিনি চাচা নেহরুর ভাগ্নি। (৩) মোট ২৫ জন তাঁদের সম্মান ফেরত দেওয়ার কথা বলেছেন, তার মধ্যে শুধুমাত্র ৮ জনই সম্মান ফেরত দেওয়ার কথা 'সাহিত্য পর্ষদে' লিখিত ভাবে জানিয়েছেন। বাকিরা শুধুমাত্র পাবলিসিটি স্টান্টের জন্য মিডিয়াতেই বলেছেন। (৪) দেশে ইমারজেন্সি ঘোষণা হওয়ার পর কেউ সম্মান ফেরত দেননি। তাঁদের চোখে তখন গণতন্ত্রের হত্যা হয়নি। (৫) সাহিত্য সম্মান পুরস্কারের সঙ্গে তাঁদের ১ লক্ষ টাকার পুরস্কারও দেওয়া হয়। কিন্তু সেই ৮ জনের মধ্যে মাত্র তিন জন ওই টাকা ফেরত দিয়েছেন। (৬) ২০১৩ সাল মজফফরপুর দাঙ্গায় ৬২ জন, আর ২০১২-তে অসম দাঙ্গায় ৭৭ জনের মৃত্যুর পরেও কোনো সাহিত্যবিদ তাদের সম্মান ফেরত দিতে চাননি। (৭) কালবর্গীর হত্যা নিয়ে সাহিত্যবিদরা সরব, কিন্তু এর আগেও একজন লেখককে এই দেশে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়, তখনও কোনো সাহিত্যবিদ তাঁদের সম্মান ফেরত দেওয়ার কথা ভাবেননি। (৮) তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ইসলামিক সংগঠনগুলি হত্যার পরোয়ানা জারি করে, তখনও কোনো সাহিত্যিবিদ তাঁদের সম্মান ফেরত দেওয়ার কথা ভাবেননি। (৯) দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কাশ্মীর থেকে ৯৫ শতাংশ কাশ্মীরি পণ্ডিতের ওপর অত্যাচার করে তাড়ানো হয়েছে। ওই ঘটনার পরেও কোনো মহান সাহিত্যিবিদের সম্মান ফেরত দেওয়ার কথা মাথায় আসেনি। কিন্তু তারা এখন ভাবছেন, কারণ কংগ্রেস ক্ষমতায় নেই। তারা এখন ভাবছেন কারণ কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনতে হবে। তারা এখন ভাবছেন কারণ দেশের মানুষ এখন মোদী প্রেমে মত্ত। তাই যে করেই হোক দেশের মানুষকে মোদীর বিরুদ্ধে ঘৃণা করা শেখাতে হবে।

—**বরুণ মণ্ডল,**
রাণাঘাট, নদীয়া।

সংশোধনী

এবার পূজা-সংখ্যায় আমার প্রকাশিত রচনায় ('মধ্যযুগের ভারত ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের সন্ধান') বেশ কিছু ভুল থেকে গেছে। আমার হস্তাক্ষরের অস্পষ্টতাই মুখ্যত দায়ী। তবু মনোজ্ঞ পাঠকের জন্য একটি সংশোধনী তৈরি করলাম। সাধারণ কোনো সংখ্যায় প্রয়োজনবোধে মুদ্রিত করলে ভালো হয়। ১। ৩৫ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ২য় উপচ্ছেদে আছে may be baidged, হবে may be bridged। ২। ৩৭ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে ৪র্থ উপচ্ছেদে আছে মহাঞ্জন, হবে মোহাঞ্জন। ৩। ৩৭ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ২য় উপচ্ছেদে আছে হাসিতে, হবে হানিতে। ৪। ৩৯ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে ৩য় উপচ্ছেদে আছে ফিরিতে বড়, হবে ফিরিতে রত। ৫। ৩৯ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ২য় উপচ্ছেদে আছে ব্যঙ্গ করে গেছেন, হবে ব্যক্ত করে গেছেন। ৬। ৪২ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে ২য় উপচ্ছেদে আছে ন্যায়াধীনের, হবে ন্যায়াধীশের।

—**অচিন্ত্য বিশ্বাস,**
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, যাদবপুর,
বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২।

Wish you very happy :

BISHWANATH DHANANIA

প্রতিবাদী ভাষার রাজনীতিকরণ বন্ধ হোক

ভাস্কর ভট্টাচার্য্য

পাকিস্তানি গায়ক (গজল) গুলাম আলির গান গাওয়ার ব্যাপারে শিবসেনার যে ঘোষিত বার্তা, তাকে কেন্দ্র করে যে তর্কের আলোড়ন উঠেছে এবং যেভাবে এই বার্তাকে জনমানসে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচার করা হচ্ছে তা দেখে আমি একজন ভারতবাসী ও হিন্দু সমাজের শিক্ষিত মানুষ হিসাবে এর প্রতিবাদ না করে থাকতে পারলাম না। আমার বক্তব্যর দায় সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। একটি অগ্রণী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলমে সুন্দর ভাষার ব্যবহারে এবং মার্জিত শব্দচয়ন করে এমনভাবে এই ঘটনাকে উপস্থাপনা করা হয়েছে, মনে হচ্ছে ভারতের গৌরবময় ধর্মনিরপেক্ষতা বা সহিষ্ণুতা বোধ হয় ভেঙে পড়তে চলেছে। তসলিমা নাসরিনের মতো লেখিকা যখন বলছেন যে ভারত দ্রুত 'হিন্দুসৌদি' হইয়া উঠিতেছে কিনা? তখন তাঁর মনে পড়ল না এক সময়ে যখন তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার জন্য অন্য একটি সম্প্রদায়ের মানুষরা কলকাতার বুকে যে তাণ্ডব রচনা করেছিল, যার জন্য মিলিটারি নামাতে রাজ্যসরকার বাধ্য হয়েছিল। সরকার সেই অশুভ দাবিকে মেনে নিয়ে তাঁকে রাজ্য থেকে প্রায় তাড়িয়ে দেয়, তখন কিন্তু এই হিন্দু সমাজ তাঁর পাশে ছিল। এই 'সিন্ধু সৌদি'ই ওই আক্রমণকে নিন্দা করেছিল। তখন কিন্তু ওই সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে কাউকে একটি কথাও বলতে শোনা যায়নি। সুতরাং তাঁকে আমি নিশ্চিন্ত করতে পারি যে হিন্দুজাতি সবাইকে নিয়ে চলার ক্ষমতা রাখে বলে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার শতাংশ বেড়েছে কিন্তু কমেনি।

অর্থাৎ তারা ভারতকে এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলেই ভাবে। এবং তার মূল কৃতিত্ব ভারতীয় হিন্দুদের। কিন্তু যে অসহনশীলতার কথা বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং সংবাদমাধ্যমের মধ্য দিয়ে জনগণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে, তা ভারতবাসীর সদ্‌ভাবনার মধ্যে চিড় ধরানোর পক্ষে যথেষ্ট।

গায়ক গুলাম আলির গানের শ্রোতা আমিও এবং তাঁর গানের গুণমুগ্ধ। বড়ে গোলাম আলি যিনি ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, তার সম্প্রদায়গত অবস্থান না ভেবে আমরা ভারতীয়রা সবাই তাঁর গুণমুগ্ধ। কোনোদিন তাঁর সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন, সঙ্গীত তার নিজের মহিমাতে সমস্ত রাজনৈতিক প্রাচীর ভেদে সবার কাছে গ্রহণীয়। এখানে সেই সঙ্গীত বা গুলাম আলিকে কোনো অপমান বা অশ্রদ্ধা দেখানোর জন্য আমার মনে হয় না শিবসেনা এই কথা বলেছে। কোনো সঙ্গীতশিল্পী তিনি যদি পাকিস্তানের নাগরিক হন, তাহলে তাঁর কাছে ভারতীয় শ্রোতাও যা পাকিস্তানি শ্রোতাও তাই। তাঁর কাছে ভারতও যা পাকিস্তানও তাই। আমাদের কথার (শিবসেনার) মারপ্যাঁচে না গিয়ে তার অন্তর্নিহিত বক্তব্য কি, তা যদি উপলব্ধি করতে পারি তাহলে এত হাহাকার রব ভারতে উঠত না। এই আর্তনাদ সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এ এক রাজনৈতিক খেলা যাকে দিয়ে বর্তমান শাসককে নাস্তানাবুদ করা যায়, সাধারণ নাগরিকের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়। কিন্তু যারা এই কাজে আজ লিপ্ত তাদের প্রশ্ন করতে চাই, যখন কাশ্মীরে পাকিস্তান প্রেরিত সন্ত্রাসীদের হাতে আমাদের দেশের সৈন্য, অফিসার মারা যাচ্ছে, যখন সারা ভারতে সন্ত্রাসবাদীরা (পাকিস্তানের) বোমার আঘাতে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ মারছে, বছরের পর বছর ধরে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে আপনার-আমার ঘরের ছেলেমেয়েদের মৃত্যুর দরজা দেখিয়ে দিচ্ছে, তখন গোলাম আলি সাহেবের কাছ থেকে তাঁর অশ্রুসজলিত চক্ষে তাঁর প্রিয় ভারতীয় শ্রোতার মৃত্যুতে কোনো শোকজ্ঞাপন দেখতে পাই না। কেন তাঁর কণ্ঠস্বর পাকিস্তানের সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে না। আগে তো তিনি একজন মানুষ। অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। পরে গায়ক। যাঁরা আজকে খেতাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তাঁরা সেদিন কোথায় ছিলেন যখন শত শত নিরীহ মানুষ, মুম্বইয়ে ট্রেনে করে যাওয়ার সময় পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা ভয়াবহ বিস্ফোরণে, আত্মীয়পরিজন ছেড়ে চিরতরে চলে যেতে বাধ্য হলেন। কোথায় ছিল তখন কুম্ভীরাশ্রু এইসব কাগজের সম্পাদকদের?

ভারতে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ইমামগণ নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দেবার জন্য তখন কেন কোনো বিবৃতি দিলেন না পাকিস্তানের বিরুদ্ধে? কারণ তাদের কারোর সেই তাগিদ নেই। ভারতকে অখণ্ড রাখার তাগিদ তাদেরই আছে যারা ভারতকে নিজেদের দেশ বলে ভাবে। ভারতকে তাদের মা বলে ভাবে। সেখানে কোনো রাজনীতির নোংরা খেলার স্থান নেই।

আজ যদি প্রশ্ন ওঠে যে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক কোথায়? নিশ্চয়ই সঙ্গীতের কোনো সম্পর্ক নেই। আছে শুধু প্রতিবাদের এক ভিন্ন রূপ। পাকিস্তানের প্রতি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে এক অমোঘ বার্তা যে, সর্বস্তরে আমরা এবার তোমাদের বিরোধিতা করতে নেমেছি এক সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে যারা বন্দুক হাতে, অস্ত্র হাতে এর প্রতিবাদ করতে পারছে না।

ভারতের মানুষের পক্ষ থেকে শিবসেনার এই বার্তা শুধু প্রতীকী বিরোধ মাত্র বলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি। এটা সঙ্গীতের বিরুদ্ধেও নয় বা শিল্পীর বিরুদ্ধেও নয়। এটা পাকিস্তানের মতো সন্ত্রাসবাদীর আশ্রয়ে থাকা সেখানকার রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি বার্তা যে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করলেও ভারতবাসী তোমাদের এই অন্যায় এবং ধ্বংসকারী নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরে প্রতিবাদ করবে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের অশ্রদ্ধা জাহির করবে দেশের মানুষের প্রতি তাদেরও আমরা ক্ষমার চোখে দেখবো না। তারা ছদ্মবেশী ভারতবিরোধী। আমি মনে করি, যতদিন না পাকিস্তান তার এই ছায়াযুদ্ধ বন্ধ করছে, সন্ত্রাসবিরোধী ভূমিকা পালনে সক্রিয় হচ্ছে, ততদিন সমস্ত ভারতবাসীর উচিত ওই দেশের সমস্ত কিছু বর্জন করা। যে রাজ্য দু'টি (দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গ) এর বিরোধিতা করে ওই গায়ককে ডেকে এনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে তারা নিজেদের রাজনৈতিক লাভের কথা ভাবল, ভাবল না ভারতের জনগণের আবেগ।

(লেখক, আইনজীবী)

শক্তিপূজা ও স্বামীজী

ভগিনী নিবেদিতা

স্বামীজীর জীবনের এই অংশের যে পরিচয় আমি কিছুটা লাভ করিয়াছি, তাঁহার শক্তিপূজার উল্লেখ ব্যতীত উহার বিবরণ নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ভারতবর্ষে জগন্মাতাবোধক ‘মা’ শব্দ সর্বদা তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। আমরা যেমন পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত পরিচিত কাহারও সম্পর্কে কথা বলিয়া থাকি, জগন্মাতাকে তিনি ঠিক সেইভাবে উল্লেখ করিতেন। সর্বদা তিনি জগন্মাতার চিন্তায় তন্ময় থাকিতেন। জগন্মাতার অপর সন্তানগণের ন্যায় তিনি সব সময়ে শান্তশিষ্ট ছিলেন না। কখন কখনও দুষ্ট ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেন, কিন্তু সকল সময়ে তাঁহারই অনুগত। শুভ অশুভ যাহাই ঘটুক সকলই জগন্মাতার ইচ্ছায়, অপর কাহাকেও তিনি দায়ী করিতেন না। কোনো এক ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে তিনি তাঁহার এক শিষ্যকে একটি মাতৃ-প্রার্থনা শিখাইয়া দেন, ওই প্রার্থনা তাঁহার নিজের জীবনে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য করিয়াছিল। তারপরে সহসা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে শিষ্যের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘‘আর দেখ, শুধু প্রার্থনা করা নয়, তাঁকে জোর করে ওটা পূরণ করাতে হবে। মায়ের কাছে ও-সব দীন-হীন ভাব চলবে না।’’ মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তিনি হঠাৎ কোনো নূতন বর্ণনার আংশিক অবতারণা করিতেন। মায়ের দক্ষিণ হস্ত বরাভয় প্রদানের জন্য উত্তোলিত, বামহস্তে ধৃত খড়্গ। তন্ময়ভাবে দীর্ঘকাল চিন্তা করিতে করিতে সহসা তিনি বলিয়া উঠিতেন, ‘‘তাঁর শাপই বর।’’ অথবা ভাবাবেগে কখনও কবির ভাষায় বলিতেন, ‘‘অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিভৃত হৃদয়কন্দরে মায়ের রুধিররঞ্জিত অসি ঝক্‌মক্ করে। এঁরা আজন্ম মায়ের অসি-মুণ্ড বরাভয়করা মূর্তির উপাসক।’’ এই সময়ে আমি ‘জগন্মাতার বাণী’ (‘Voice of the Mother’) নাম দিয়া যে ক্ষুদ্র স্তোত্রটি রচনা ও প্রকাশ করি, তাহার প্রায় প্রত্যেকটি ছত্র ও বর্ণ তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে এই সব মুহূর্তগুলিতে সংগৃহীত। তিনি সর্বদা বলিতেন, ‘‘আমি ভয়ঙ্করা রূপের উপাসক!’’ একবার বলিয়াছিলেন, ‘‘এ-কথা মনে করা ভুল যে, সকলেই সুখের আশায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়। বহুলোক আছে যারা জন্মাবধি দুঃখকে খুঁজে বেড়ায়। এস, আমরা ভয়ঙ্করা মায়ের জন্যই তাঁর ভয়ঙ্করা মূর্তির উপাসনা করি।’’

ভয়ঙ্করা মূর্তির পূজা এবং উহার সহিত একাত্মতালাভের প্রসঙ্গে শান্তভাবে কথা বলিতে বলিতে তিনি সহসা উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠেন, ‘‘মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী’। মূর্খ তারা!’’ এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার হৃদয়ঙ্গম হইল যে, ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতরূপে প্রকাশিত যে ঈশ্বর, তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া যে ঈশ্বর দয়াময়, যিনি পালনকর্তা, শোকে-দুঃখে যাঁহার নিকট সান্ত্বনালাভ করা যায়, তাঁহার উদ্দেশে নিবেদিত যে পূজা, তাহার মূলে অহংজ্ঞানই বিদ্যমান। বুঝিতে পারিলেন, এই ধরনের পূজা হিন্দুরা যাহাকে প্রকৃতপক্ষে ‘দোকানদারি’ বলিয়া অভিহিত করেন, তাহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উপলব্ধি করিলেন, মঙ্গলের মধ্যে তাঁহার যেরূপ প্রকাশ, অমঙ্গলের মধ্যেও সেইরূপ এবং এই শিক্ষা পূর্বোক্ত শিক্ষা অপেক্ষা বহুগুণ নির্ভীক ও সত্য। দেখিলাম, কাঁচা আমির গণ্ডি অতিক্রম করিতে হইলে যে মনোভাব ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন, তাহা বস্তুতঃ দৃঢ়সঙ্কল্প, স্বামীজী কঠোর ভাষায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, ‘জীবন না চাহিয়া মৃত্যুকে অনুসন্ধান করিতে হইবে, নিজেকে তরবারিমুখে নিক্ষেপ করিতে হবে, চিরকালের জন্য ভয়ঙ্করা মূর্তির সহিত একাত্ম হইতে হইবে।’

একদিন তাঁহার নিকট বসিয়া আছি, এমন সময়ে ওই স্থানে একখানি কালী প্রতিমা আনীত হয়। প্রতিমার মধ্যে কোনো একটি ভাব চকিতের মতো লক্ষ্য করিয়া আমি সহসা বলিয়া উঠিলাম, ‘‘স্বামীজী, হয়তো মা-কালী সদাশিবেরই ধ্যানযোগে উপলব্ধ মূর্তিবিশেষ। তাই কি?’’ তিনি মুহূর্তের জন্য আমার দিকে চাহিলেন। পরে সস্নেহে বলিলেন, ‘‘বেশ, তাই হোক, তোমার নিজের ভাবেই ওটি প্রকাশ কর!’’

তিনি বলিতেন, ‘‘দেখ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোথাও এমন এক মহাশক্তি আছেন, যিনি নিজেকে প্রকৃতি-সত্তা বলে মনে করেন। তাঁরই নাম কালী, তাঁরই নাম মা!... আবার আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাস করি!... কিন্তু এই রকমই সর্বদা হয় না কি? শরীর মধ্যস্থিত অসংখ্য কোষ মিলিত হইয়া এক ব্যক্তি সৃষ্টি করে না কি? এক নয়, বহু মস্তিষ্ককেন্দ্রই কি মনের অভিব্যক্তি ঘটায় না? বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেই একত্ব— এই আর কি! তবে ব্রহ্মের বেলায় অন্যরূপ হইবে কেন? ব্রহ্মই একমাত্র সৎ পদার্থ, তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনিই আবার দেবদেবীতে পরিণত!’’

তিনি বলিতেন— মা যেন একখানি মহাগ্রন্থ; যাহা পাঠ করিয়া মানব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে; পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উলটাইয়া অবশেষে দেখে, উহাতে কিছুই নাই। আমার মনে হয় ইহাই চরম ব্যাখ্যা। ভারতের ভাবীযুগের বংশধরের একমাত্র উপাস্য হইবেন মা-কালী। তাঁহার নাম লইয়াই মাতৃভক্ত সন্তানগণ নানা অভিজ্ঞতার শেষ সীমায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবেন। তথাপি সর্বশেষে তাঁহাদের হৃদয়ে সেই সনাতন জ্ঞানের বিকাশ ঘটিবে এবং প্রত্যেক মানব নিজ নিজ শুভ মুহূর্ত উদয় হইলে জানিতে পারিবে যে, সমগ্র জীবন ছিল এক স্বপ্নমাত্র।

(উদ্বোধনের ‘স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত)

ত্রিবেণীর ডাকাতে কালী

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

এখন ত্রিবেণীর এই অঞ্চলটির নাম কালীতলা। ব্যান্ডেল থেকে অটো ধরে বা চুঁচুড়ায় বাসে চেপে মগরার দিকে যেতে পড়ে কালীতলা বাস স্টপেজ।

রাস্তার বাঁ-দিকে কালীমন্দির। মন্দিরের তেমন বিশেষত্ব নেই। পাতলা ইট দিয়ে তৈরি। উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট। এক চূড়া বিশিষ্ট। একটিমাত্র প্রবেশদ্বার। মন্দির ঘিরে বিশাল চত্বর। পুরোটাই শান বাঁধানো। মন্দিরের সামনে টিনের ছাউনির নাটমন্দির। নাটমন্দিরে পশুবলি, ফল বলি দেবার যূপকাষ্ঠ। সম্মুখে একটি বড়ো পুকুর, দেবীর পুকুর। সাধারণে ব্যবহার করে না। ভক্তেরা স্নান করে পুজো দেয়, মানত করে।

পুকুরের ধারে একটি বিশাল বটগাছ। ঝুরি নেমেছে অজস্র। ঝুরিতে বাঁধা আছে ধূপকাঠির প্যাকেটের ভিতরের প্লাস্টিকের অংশগুলি। এগুলি মানতের সাক্ষ্য। এছাড়া বটগাছের তলায় আছে শিবলিঙ্গ। আর আছে সাধু মা'র বেদি। বহুদিন পূর্বে এক তরুণী সন্ন্যাসিনী এখানে সাধনার আসন পেতেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর কাছে খারাপ মতবল নিয়ে এলে ক্ষতি হোত। এই বেদি তাঁরই।

মন্দিরের পেছনে ফুলের বাগান। অধিকাংশ গাছ জবাফুলের। এই ফুলে মায়ের পূজা হয়। একটি ছোট বেলগাছও আছে। মন্দিরের ডানদিকে চত্বর। চত্বর প্রসারিত হয়ে চলে গেছে রাস্তা বরাবর। রাস্তার পাশে চক্রবর্তী পরিবারের বাড়ি। মন্দিরের সেবায়েত ও স্বত্বাধিকারী তাঁরাই। তাঁরাই মায়ের পূজা, দেখাশোনা সবকিছু করেন।

আনুমানিক তিনশ' বছর আগে মা কালীর পূজার্চনা করত এই অঞ্চলের আতঙ্ক বুধো ডাকাত। সেই সময় এখানে ছিল গভীর জঙ্গল। এমন জঙ্গল যে মাঝেমধ্যে বাঘেরও দেখা মিলত। যার জন্য লোকমুখে অঞ্চলটির নাম হয়ে গিয়েছিল বাঘাটি, যা অপভ্রংশে এখন বাগানটি-তে দাঁড়িয়েছে। এই জঙ্গলে কুখ্যাত বুধো ডাকাত তার দলবল নিয়ে বাস করত। কারও কারও মতে সে নাকি হাড়-হিম করা দস্যু সর্দার রঘু ডাকাতের ভাই। বুধোর দৌরাত্ম্যও কিছু কম ছিল না। মশাল জ্বেলে সদলবলে ডাকাতি করতে যাবার আগে তার আরাধ্যা কালীর কাছে মানত করে যেত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলও হোত। ধুমধাম করে মায়ের পুজো দিত।

একবার বুধোর দলে বিশেষ ক্ষতি হয়। কেউ কেউ ধরা পড়ে, কেউ প্রাণ হারায়। বুধো কোনোক্রমে বেঁচে যায়। এতে বুধো এতটাই রেগে যায় যে, ক্ষিপ্ত হয়ে মায়ের গায়েই খড়্গাঘাত করে। ফলে দেবীর অঙ্গহানি হয়। পরে নাকি স্বপ্নাদেশ পেয়ে বুধোর অনুশোচনা হয় এবং মায়ের অঙ্গ আবার ঠিকঠাক করে দেয়।

মায়ের মূর্তি তখন ছিল মৃন্ময়ী, এখন সিমেন্টের প্রতিমা। ভয়াল দর্শন হলেও চক্রবর্তী পরিবারের মতে আগের তুলনায় মা সৌম্যমূর্তি ধারণ করেছেন। অধিকাংশ ডাকাতেকালী মতো ত্রিবেণীর এই ডাকাতেকালীর মূর্তি সিদ্ধেশ্বরী কালীর মূর্তির মতোই। একটি পা হাঁটু পর্যন্ত ভেঙে এবং ডান হাতটি তুলে পূর্বদিকে মাথা রেখে শায়িত শিবের উপর দক্ষিণাস্য হয়ে মা দণ্ডায়মান। প্রতিমার উচ্চতা প্রায় সাত ফুট। চোখ দীর্ঘ, নাক তীক্ষ্ণ, ক্ষুদ্র রক্তিম জিব। মাথায় দীর্ঘ মুকুট, হাতে কৃপাণ। গায়ে সোনা রুপোর অলঙ্কার নেই। একবার চুরি হয়ে যাবার পর অনুষ্ঠান ছাড়া অলঙ্কার পরানো হয় না। দেবী স-বসনা। মুক্ত কেশা। মূর্তি সিমেন্টের হলেও ৩০-৩৫ বছর অন্তর নবকলেবর হয়। যদিও কখন হবে তা দেবী নিজেই কোনো না কোনো ভাবে জানিয়ে দেন। একথা জানালেন চক্রবর্তী পরিবারের গৃহকর্ত্রী প্রতিমা চক্রবর্তী (৫৯)।

দেবীর বেদির নীচে আছে পঞ্চমুণ্ডির আসন। এক সময় বুধো ডাকাত এখানে প্রচুর নরবলি দিয়েছিল। আজও মন্দিরের আশেপাশে মাটি কোপালে বেরিয়ে আসে মানুষের হাড়গোড়, করোটি। মন্দিরের প্রাঙ্গণ পাকা করবার সময় মাটির তলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল প্রচুর হাড়। প্রতিমা চক্রবর্তীরা শৈশবে মাটি থেকে উঠে আসা এরকম করোটি নিয়ে খেলাধুলাও করেছিলেন।

পরম্পরা

মায়ের নিত্যপূজা, নিত্য অন্নভোগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

দীপান্বিতা অমাবস্যায় বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা হয়। রাতে একটি নিকষ কালো পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। পাঁঠাটি আসে চক্রবর্তী পরিবার থেকে। মাঝরাতে মশাল জ্বালিয়ে আনা হয়। বলি দেবার সময়ও মশাল জ্বলে। বুধো সর্দারের আমলে যেমন হোত। সেই ঐতিহ্য ধরে রাখা হয়েছে এখনও।

দেবীর বাৎসরিক পূজা মহা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় সরস্বতী পূজার পরের শনি বা মঙ্গলবারে। যে বারটি প্রথম পড়ে। দেবী ঠিকঠাক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তা যেমন জানা নেই, আবার বুধো ডাকাতেরও কোনো প্রামাণিক ইতিহাস নেই। তবে ওই দিনটিকে দেবীর প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে ধরে নিয়ে বিশেষ পূজার্চনা হয়। এটিই ডাকাতে কালীর সবচেয়ে বড়ো উৎসব। এই উপলক্ষে ভালোই আড়ম্বর হয়, প্রচুর জন-সমাগম হয়। দেবীর উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নভোগ প্রসাদ রূপে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মন্দির চত্বরে যাত্রাপালা, নাটক, গান বাজনা— এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

এরপর শনি, মঙ্গলবারে স্থানীয় মানুষজন সপরিবারে এসে রান্নাবান্না করে। রান্না হয় পাঁচরকম, যার যেমন সাধ্য। পাত পেড়ে খাওয়া-দাওয়া হয় পিকনিকের মতো। একে 'পালুনি' বলা হয়। মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাসের শনি, মঙ্গলবারেই পালুনি পালিত হয়।

খাওয়া-দাওয়া সেরে চত্বর ছাড়ার পূর্বে ভালভাবে পরিষ্কার করে যাওয়ার নিয়ম। এমন হয়েছে, খাওয়া-দাওয়া করে চলে গেছে কিন্তু ভালভাবে পরিষ্কার করে যায়নি, মা চক্রবর্তী পরিবারকে স্বপ্নে জানান, উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে, তাঁর অসুবিধে হচ্ছে।

মায়ের মন্দির

মায়ের জাগ্রত মহিমার এরকম অনেক ঘটনা জমা আছে প্রতিমা দেবীর ভাণ্ডারে। এরকম একটি ঘটনা— পাশের বাগাটি কলেজের এক অধ্যাপক তাঁর নবদ্বীপের বাড়ি থেকে নিয়মিত যাতায়াত করেন। ত্রিবেণী স্টেশন থেকে বাগাটি যাবার পথে কালীমন্দিরটি পড়ে। তিনি বাস থেকে মন্দিরটি দেখেন, জানেন এখানে এক কালী আছেন। মায়ের উদ্দেশে নিত্য প্রণাম জানান। মা একদিন স্বপ্নে অধ্যাপককে বললেন, তুই তো আমাকে প্রণাম করিস, তা আমাকে একবার দেখতে তোর ইচ্ছে হয় না? আমাকে একবার দেখে যা।

এরপর এই ভাগ্যবান অধ্যাপক মন্দিরে এসে মা-কে দর্শন করে পূজা দিয়ে প্রতিমা চক্রবর্তীকে এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানান। মায়ের নিত্য পূজার্চনা তো হয়, অন্নভোগও নিবেদিত হয়, সেই সঙ্গে প্রতি অমাবস্যার রাতে মায়ের উদ্দেশে হোমের আগুন জ্বলে ওঠে। অমাবস্যার মধ্যরাত্রে হোম করেন প্রতিমা দেবীর বড়ো ছেলে সুমন চক্রবর্তী। প্রতি অমাবস্যাতেই হয়। একবারই হয়নি। সেবার ভাদ্রমাসের কৌশিকী অমাবস্যায় সুমনবাবু তারাপীঠ গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি মন্দির চত্বরে পড়ে যান এবং তাঁর একটি পায়ে বেশ চোট লাগে। কিন্তু সুমনবাবুকে যেটা ভাবায় তা হলো— তাঁর মনে হলো কেউ যেন তাঁকে ঠেলে ফেলে দিল, কিন্তু তাঁর আশেপাশে সেরকম তো কেউ নেই। তাহলে কে ফেলল? কে আবার? আদরিণী শ্যামা মা। আজ যে কৌশিকী অমাবস্যা। অথচ মায়ের হোম ছেড়ে তিনি চলে এসেছেন আরেক মায়ের কাছে, তারাপীঠে। তাই শ্যামা মায়ের অভিমান হয়েছে। তারপর থেকে সুমনবাবু অমাবস্যা তিথিতে আর অন্য কোথাও যান না। চক্রবর্তী পরিবার থেকে সন্তান হওয়ার ওষুধ দেওয়া হয়। যাঁদের সন্তান হচ্ছে না, হয়তো আশাও ছেড়ে দিয়েছেন, প্রতিমাদেবীর মতে, এই ওষুধে আশ্চর্যরকম ফল মেলে। সন্তানহীন দম্পতি সন্তান পায়। তবে শুধু সন্তান কামনায় নয়, জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে মানুষ এখানে আসে। তাদের বিশ্বাস, মা বড়ো জাগ্রত। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানালে মা শোনেন, প্রার্থনা পূরণ করেন। তাই শনি, মঙ্গলবারে বছরের বিভিন্ন তিথিতে মায়ের মন্দিরে ভক্তদের ভিড় লেগেই থাকে। ■

নবাঙ্কুর

আলোর উৎসব কালীপুজো

আলোর উৎসব হলো কালীপুজো। সেদিন আলো দিয়ে সাজানো হয় বাড়িঘর মন্দির সব জায়গা। ঝলমলে হয়ে ওঠে চারিদিক। সন্ধ্যেবেলা একটা দুটো তিনটে করে হাজার হাজার আলো জ্বলে ওঠে। দূর হয়ে যায় অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার। আগে যখন ইলেকট্রিক বাতি ছিল না তখন শুধুই প্রদীপ জ্বালানো হোত। তাই দিয়েই সেজে উঠত গ্রাম শহরগুলি। এখন ইলেকট্রিকের বাতি আসতে সেই রোশনাই আরো বেড়ে গেছে।

কালীপুজোর অনেক আগেই রঙ-বেরঙের আলো দিয়ে সেজে ওঠে বাড়িঘর রাস্তাঘাট।

কালীপুজো বা দীপাবলির এই আলোর উৎসব খুব আনন্দের। কিন্তু এই সময় শব্দবাজি পোড়ানোর যে প্রবণতা আছে তা দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছে। কোনো নিয়ম না মেনেই এদিকে সেদিকে দুম-দাম করে বাজি ফাটানো হচ্ছে। এর ফলে মানুষ, পশুপাখির যে কত ক্ষতি হয় তা কেউ খেয়ালই করছে না। বাজি ফাটানো খুব মজার। কিন্তু তা বেশি শব্দের হলে খুব ক্ষতিকর। বিশেষ করে শিশু, অসুস্থ বয়স্ক মানুষদের জন্য। বাড়ির বয়স্কদের এমনিতেই নানাধরনের অসুখ থাকে। অতিরিক্ত শব্দের কারণে তা আরো বেড়ে যায়। যাদের হৃৎপিণ্ডের অসুখ তাদের তো খুব কষ্ট হয়। তাই বেশি শব্দবাজি ফাটানো উচিত নয়। এতে যারা ফাটায় তাদের আনন্দ হয় ঠিকই, অন্যদিকে অনেকের তাতে কষ্ট হয়। এই শব্দবাজি ছোটদের পক্ষেও খুব ক্ষতিকর।

কারো কানের কাছে খুব জোরে বাজি ফাটলে চিরতরে শ্রবণশক্তি হারিয়ে যেতে পারে। তাই ছোটদের নিয়ে কখনও বাজি ফাটানো উচিত নয়। কালিপুজোতে অনেক সময় পাখি উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। বাজির শব্দে ওরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তখন এদিক ওদিক উড়ে বেড়ায়। শব্দবাজি একদিকে মানুষের যেমন ক্ষতি করে তেমনি পশুপাখিরও ক্ষতি করে।

বিজ্ঞান অনুসারে শব্দের মাত্রা ডেসিবেলে মাপা হয়। ৬০ ডেসিবেলের উপর শব্দ হলে তাকে শব্দদূষণ বলা হয়। অর্থাৎ এর বেশি শব্দ হলে তা ক্ষতিকারক। কালীপুজোতে বেশিরভাগ সময় এই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। একে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার অনেক আইন করেছে। কেউ যদি ৬০ ডেসিবেলের উপর শব্দবাজি ব্যবহার করে তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। শহরে যেহেতু শব্দবাজি বেশি ফাটানো হয় তাই এখানে পুলিশ খুব সতর্ক থাকে। কিন্তু পুলিশ সতর্ক থাকলে কী হবে মানুষ তো সতর্ক নয়। আইন ফাঁকি দিয়ে সবাই শব্দবাজি ফাটায়। বয়স্ক অসুস্থ মানুষের কথা, শিশুদের কথা, পশুপাখির কথা কেউ ভাবে না।

বাজি পোড়ানোয় যে কেবল শব্দ দূষণ হয় তাই নয়, এত পরিবেশও দূষিত হয়। বাজির ধোঁয়ায় যে রাসায়নিক পদার্থ থাকে তা পরিবেশকে দূষিত করে দেয়। এই সবকিছুর কথা মাথায় রেখে সবার উচিত শব্দবাজি ত্যাগ করা। তাহলে কালীপুজোর আলোয় মানুষের মনও আলোকিত হয়ে উঠবে। ■

মনীষী কথা

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা

উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা। ১৮৬৬ সালে কোচবিহারের এক প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কলকাতায় এসে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তারপর কোচবিহারে ফিরে গিয়ে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি সবাইকে শিক্ষা বিষয়ে সচেতন করে তোলেন। সেখানকার মানুষদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করেন। তিনি রংপুরে ওকালতি করতেন। ওকালতি করার সময় বহু গরিব মানুষকে সাহায্য করেন। উত্তরবঙ্গে বর্ণভেদ প্রথাকে নির্মূল করার চেষ্টা করেন তিনি। সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি বহু বই লিখেছেন। রংপুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। উত্তরবঙ্গের মানুষের উন্নতিতে একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার।

প্রশ্নবাণ

১. বিবিসি-র পুরো নাম কী?

২. রয়টার কত সালে তৈরি হয়?

৩. পি টি আই কোন দেশের সংবাদ সংস্থা?

৪. পুলিৎজার সম্মান কী বিষয়ে দেওয়া হয়?

৫. আর টি আই—আইন কত সালে পাশ হয়?

উত্তর : ১. ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন। ২. ১৮৫১। ৩. ভারত। ৪. সাংবাদিকতা। ৫. ২০০৫ সালে।

ছবিতে অমিল খোঁজ

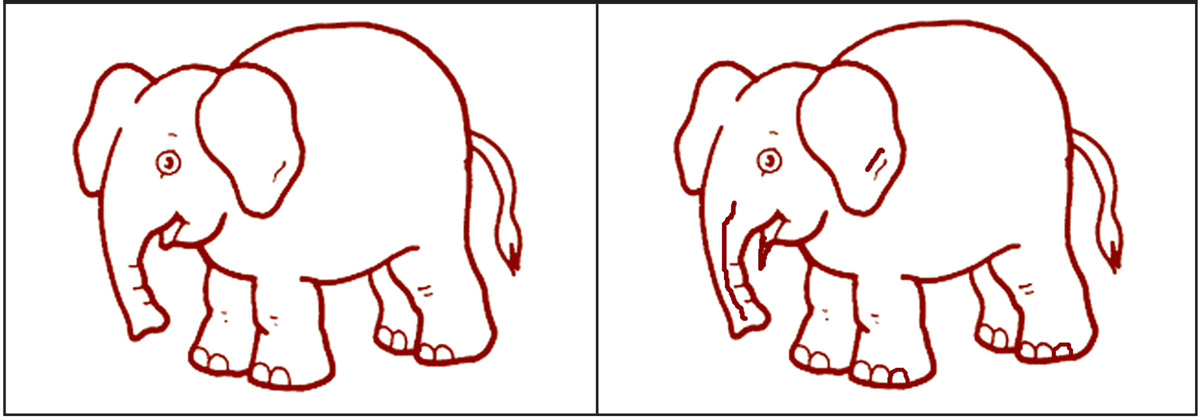

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) তি র্গ নী দু শি

(২) ং বা নী স হ

১২ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর

(১) শ্যামবাজার (২) মঙ্গলদীপ

উত্তরদাতার নাম

(১) অনুশ্রী হালদার, ট্যাংরা, কলকাতা-৪৬

(২) নিশিরাম মণ্ডল, কালিয়াচক, মালদা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) মা ত্য ক্র বি দি

(২) ঘ র ল্লা মে ম

১২ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর

(১) রামমোহন (২) শরৎচন্দ্র

উত্তরদাতার নাম

(৩) মিলন পাল, শিখরিয়াপাড়া, বাঁকুড়া

(৪) শ্রেষ্ঠা দাস, সানবাঁধা, বাঁকুড়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

SHREE NURSING TIMBER & ELECTRIC STORES

PODDAR COURT

18, RABINDRA SARANI, GATE NO. 4, 2ND FLOOR, ROOM NO. 7 & 8, KOLKATA - 700 001

PHONE : 2235-5210, 2235-2109, FAX : 91-33-2225-3373

e-mail : sntescal@yahoo.com, SMART - 2386

পুরনিগম নির্বাচন : গণতন্ত্রের প্রহসন

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতে বৃটিশ শাসনে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রথমে চালু হয়। কলকাতা কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ডে ভারতীয় প্রতিনিধিরা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রথম নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। কলকাতা কর্পোরেশন ক্রমশ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ঘাঁটিতে পরিণত হয়। কলকাতার প্রথম নির্বাচিত মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পৌর শাসনের মাধ্যমে দরিদ্রনারায়ণের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হন। দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র, ডাঃ বিধান রায়, এ.কে. ফজলুল হক সকলেই পৌর শাসনের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি ও মর্যাদা মজবুত করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামো রচিত হয়। কিন্তু স্থানীয় ভিত্তিতে গণতন্ত্রের বনিয়াদ সুদৃঢ় না হলে প্রাদেশিক স্তরে ও জাতীয় স্তরে গণতন্ত্র সুদৃঢ় হতে পারে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশ ও জাতির বিকাশে ভারতের নৈতিক সভ্যতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মতে নীতিহীনতার অভিশাপ দেশ ও সমাজকে বিপন্ন করে তোলে। উন্নত পৌর ব্যবস্থার মাপকাঠি হলো সৃজনশীল পৌর-জীবনের বনিয়াদ।

একথাগুলি উচ্চারণ করলাম এই জন্য যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পুরনিগম নির্বাচনে নীতি ও নৈতিকতার কি ছিটেফোঁটা দেখা গেছে? গণতন্ত্রে নির্বাচনী ব্যবস্থা অপরিহার্য। কিন্তু নির্বাচনী ব্যবস্থার পোশাকে যদি নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয় তাহলে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। বিধাননগর পৌর নিগম নির্বাচনে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলির (মূলত শাসক দলের) পেশী আস্ফালন দেখা গেল না, আরও ভয়ঙ্কর হলো গণমাধ্যমের উপর সুপরিকল্পিত আক্রমণ। উলঙ্গ রাজা শুম্ভ নিশুম্ভদের নিয়ে খোলা তরবারি হাতে মানুষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। এর কারণ হলো অপকীর্তি ও গণতন্ত্রের উপর বলাৎকার প্রকাশ্যে চলে আসবে। অন্যান্য এলাকার বিধায়ক, পৌর প্রতিনিধিরা কেন দাপিয়ে বেড়ালেন? একটি মজার ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস জমানার পরিবর্তে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়। সে সময় কংগ্রেস ২৮০ সদস্যের বিধানসভায় ১২৮টি আসন পায়। চৌদ্দজন বাড়তি সদস্যের সমর্থন পাওয়া এমন কিছু ব্যাপার ছিল না। কিছু অতি উৎসাহী অবাঙালি ব্যবসাদার কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষকে বলেছিলেন, ‘লেকিন’ আপনি চাইলে চৌদ্দজনের সমর্থন ম্যানেজ করে দেবো। অতুল্য ঘোষ বলেছিলেন, ‘লেকিন’ কী? ‘লেকিন’-এর প্রশ্ন উঠছে কেন? আমরা পরাজিত, মানুষের রায় মেনে নিতে হবে। সেই সময় কংগ্রেস দল ছিল ক্ষমতাসীন, কোথাও পার্টি ক্যাডার ও পুলিশের ভূমিকা ছিল বলে মনে হয় না। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন স্বয়ং পরাজিত হলেন। আরামবাগের গান্ধীকে আরামবাগের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

(ফাইল চিত্র)

এই ঘটনা লিখলাম এই জন্য যে গণতন্ত্র সুচারুভাবে প্রয়োগ করতে হলে শাসকদলের ক্যাডার বাহিনীর তাণ্ডব নৃত্য একেবারে বন্ধ করা প্রয়োজন আর পুলিশ বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় নীরব দর্শক সাজিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি। গণতন্ত্রের মুখোশ ধরে অভিনয় করতেই হবে, কারণ ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসতে হবে আর ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে গেলে খানাপিনা কায়েমি স্বার্থ চলবে কী করে? তাই বিধাননগরের মতো সচেতন জায়গার মানুষদের রেয়াত করা চলবে না। কেননা তাঁদের চোখে এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।

কিন্তু শাসক পার্টিকে একতরফা দোষ

দিয়ে লাভ কী? পশ্চিমবাংলার দলিত গণতন্ত্রে ভোট লুট আর পেশী আস্ফালন প্রচলিত সংস্কৃতি। স্বদেশি আন্দোলনের বাংলা এখন ছিন্নমস্তা রাজনীতির অভয়ারণ্য। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে ভজনা শোনা যায়। নেতাজী ও স্বামীজীর নাম উচ্চারণ লুম্পেন রাজনীতির ধারক ও বাহকদের মুখে শোভা পায় না। আবার দুর্গতিনাশিনী দুর্গাপূজার আসরে রাজনীতির কারবারি ও তাদের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর দাপাদাপি দেখা যায়। নীতিহীন সমাজ- বিরোধী রাজনীতি করবেন আবার সর্বজনীন পূজায় আসর জাঁকিয়ে বসবেন— এ তো প্রহসন মাত্র। মনে রাখবেন 'বিনাশায় দুষ্কৃতাম্' প্রকৃত ধর্ম আর দুষ্কৃতীরা অধর্ম ও অপশাসনের রূপকার। অনেকদিন থেকেই রাজনীতিতে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন আসর জমিয়েছে। এরই প্রভাব পড়ে ভোটের রাজনীতিতে। ভোট লুঠ এরই অনিবার্য পরিণতি।

ভাবতে খারাপ লাগে কেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এতটা কালিমালিপ্ত। এর শেকড় রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির চরিত্রে। বিগত চার দশকের বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিপথগামী। ইতিপূর্বে মূল দুই রাজনৈতিক শাসকদলের কীর্তিকলাপ দেখলে বোঝা যায় ভোট লুণ্ঠন ও ক্ষমতা দখল কীভাবে আসর জমিয়েছে। ১৯৭২ সালের নির্বাচন 'জালিয়াতির নির্বাচন' নামে সুপরিচিত। কংগ্রেস দলের নেতাকর্মীদের কেরামতিতে প্রধান বিরোধীদল সি পি আই (এম) মুখ থুবড়ে পড়ে। স্বয়ং জ্যোতি বসু বিপুল ভোটে হেরে যান। ১৯৭০ সালের পর থেকেই কংগ্রেস দলে পরিবারতন্ত্র কায়েম হয়। যে দলের ভেতরে গণতন্ত্র নেই, তারা কীভাবে গণতন্ত্রকে বহাল রাখবে? ইন্দিরা, সঞ্জয়, রাজীব, সোনিয়া থেকে রাহুল কংগ্রেস দলকে নিজেদের জমিদারি করে তুলেছেন। আর রয়েছে স্তাবকের দল। কংগ্রেস থেকে নির্গত দলগুলি সেই ঐতিহ্যের অনুসারী। দলের মধ্যে দমবন্ধ করা অবস্থা আর গোষ্ঠী রাজনীতির উপদ্রব গণতন্ত্রের পক্ষে আদৌ মঙ্গলজনক নয়।

১৯৭৭ থেকে চৌত্রিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দু'ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। একটি হলো বিজ্ঞানসম্মত রিগিং। ভোটার তালিকা থেকে ভোটগ্রহণ ও ভোটগোনা পর্যন্ত দুধে জল মেশানোর খেলা শুরু হয়। তাই সি পি আই (এম) দল 'কৌশল পার্টি অব ইন্ডিয়া' নামে পরিচিত হয়। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের নামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পৌরসভা, পৌরনিগম সর্বত্র দলতন্ত্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বলবৎ হয়। সর্বত্রই বিজ্ঞানসম্মত ভোট চুরির পদ্ধতি প্রসারিত হলো। আর ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসের মাধ্যমে সরাসরি ভোট লুণ্ঠন শুরু হয়। আরামবাগে লোকসভা নির্বাচনে অনিল বসু পাঁচ লক্ষের বেশি ভোটে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মতো জনপ্রিয় নেতা বুঝি আর কেউ নেই!

২০১১ সালে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচনী রাজনীতিতে বিপ্লব ঘটে গেল। ভোট লুণ্ঠন নয়, জনরোষের স্রোতে বাম জমানার অবসান ঘটল। কিন্তু তারপর? ক্ষমতার হাত বদল হলো সত্য, কিন্তু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উজ্জীবন ঘটল না। আগে বিধাননগরে ভোট লুঠ হোত সুকৌশলে, আড়ালে আবডালে। কিন্তু সাম্প্রতিক পৌর নিগমের নির্বাচনে যা ঘটল তা এক কথায় অভাবনীয় ও ভয়াবহ। কিন্তু সি পি আই (এম) কথিত গণপ্রতিরোধের আস্ফালন কেন চুপসে গেল? এর একমাত্র উত্তর হলো প্রশাসন বিশেষত পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বোঝা গেল সিপিআই (এম)-এর মজবুত সংগঠন স্বয়ংক্রিয় নয়। ক্ষমতাসীন থাকলে পুলিশ পাশে থাকবে। আর পুলিশ শাসকগোষ্ঠীকে মেনে চলে। তাই আইন শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত হলেও পুলিশ তাদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ঝুঁকি নেয় না। মজার কথা হলো, দিল্লীতে পুলিশ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু বিগত বিধানসভার নির্বাচনে ৭০টি আসনের মধ্যে ৬৭টি-তে আম আদমি পার্টি জয়ী হয়। বিজেপি মাত্র তিনটি আসন পায়। দিল্লীর পুলিশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু পুলিশ বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে কি বিজেপি ভোট চুরি করেছিল? আসলে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলিকে পালন করতে হবে। আর বেশি দায়বদ্ধতা শাসক দলের।

সম্প্রতি পুরনিগম নির্বাচনে মজার ঘটনা হলো নির্বাচন কমিশনার মাঝপথে পদত্যাগ করলেন। তারপর অস্থায়ী কমিশনার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর নিয়োগের বৈধতা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। রায়দান হবে ২৩ নভেম্বর। এরই মধ্যে ভোট গণনার কাজ শেষ। শাসকদলের জয় জয়কার। বিরোধীরা ধরাশায়ী। আর বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে বিধাননগর এলাকায় বেশি ভোট পেলেও এখন একটি আসনেও জেতেনি। বরং সিপিএম ও কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়নি।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, ১১ অক্টোবর লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মদিন পালনে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কলুষতা থেকে মুক্ত করতে হলে তাঁকে স্মরণ করা আবশ্যক। তাঁরই নেতৃত্বে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতন্ত্র বিধ্বস্ত হয়েছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণের অবদান গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায়।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আর্কাইভ)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

নাগপুরে বিজয়াদশমী উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ

চাই ‘এক জনসংখ্যা’ নীতি : ভাগবত

বিজয়াদশমী উৎসব উপলক্ষে আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। সঙ্ঘ কাজের আজ ৯০ বছর পূর্ণ হলো। এ বছর ড. ভীমরাও আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী বর্ষ। সারাদেশে সামাজিক ভেদভাবের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি সারাজীবন সংঘর্ষ করেছেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতে সেই ভেদভাবকে নির্মূল করে তিনি সমতা স্থাপনের ব্যবস্থা করে গেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর ভাষায় আচার্য শঙ্করের প্রখর মেধা এবং তথাগত বুদ্ধের অসীম করুণা তাঁর প্রতিভার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

গত বছর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ হেডগেওয়ারের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী বর্ষ ছিল। সমতাযুক্ত শোষণমুক্ত হিন্দু সমাজের সম্মিলিতি শক্তির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বে উদাহরণস্বরূপ পরম বৈভবসম্পন্ন ভারত নির্মাণের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। সেই লক্ষ্যের জন্য সৎভাবে, নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে এবং তনমন-ধনপূর্বক সতত প্রয়াসকারী কার্যকর্তা নির্মাণের পদ্ধতি দিয়ে গেছেন। সেই কার্যপদ্ধতির জ্ঞাতা, সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক স্বর্গীয় বালাসাহেব দেওরসের জন্মশতাব্দীবর্ষ শুরু হয়েছে। সঙ্ঘেরই কার্যপদ্ধতিতে পরিপুষ্ট হওয়া এবং ভারতীয় দর্শনসমূহের সনাতন মূল্যবোধের ভিত্তিতে রাষ্ট্র- ব্যবস্থার পরিপূর্ণ ও যুগানুকূল ভাবনায় দিগ্‌দর্শন করা ‘একাত্ম মানবদর্শন’-এর দ্রষ্টা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতাব্দীবর্ষও শুরু হয়ে গিয়েছে।

সুখদায়ক সংযোগ এমন যে, ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে ভারতীয় সংস্কৃতির মঙ্গল-পতাকা উড্ডীনকারী রাজরাজেশ্বর রাজেন্দ্র চোল মহারাজার রাজ্যারোহণেরও সহস্রতম বর্ষ পালিত হচ্ছে এবং জাতপাতের ভেদভাবকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে, কু-প্রথার শৃঙ্খল ভেঙে ভক্তিমার্গে সমাজের সবাইকে প্রবেশাধিকার দিয়ে, সামাজিক সমানতা জাগরণের পুনঃপ্রবর্তনকারী শ্রীরামানুজাচার্যের সহস্রতম জন্মজয়ন্তী আগামী বছর পালনের প্রস্তুতি সমাজে চলছে। জম্মু-কাশ্মীরে শৈব সিদ্ধান্তের মহান আচার্য অভিনব গুপ্তেরও সহস্রতম জন্মজয়ন্তী বর্ষ চলছে। ‘কর্মসু কৌশলম্’ ও ‘সমত্ব’-এর সঙ্গে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিরন্তর যথাবিধি কর্ম করার বার্তা প্রদানকারী শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ৫১৫১তম বর্ষ আগামী গীতাজয়ন্তী পর্যন্ত চলবে।

এ বছর সমাজের দু’জন অতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দেশগৌরব জাগিয়ে, তাদের দেশের জন্য প্রতি ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত করার প্রেরণা দেওয়াকেই জীবন লক্ষ্য করা পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ড. আবদুল কালাম এবং বৈদিক শিক্ষকরূপে আমাদের সমাজে তথা বিশ্বে সনাতন সংস্কৃতির বিষয়ে যুগানুকূল দৃষ্টি, গৌরব ও সক্রিয়তা জাগরণকারী স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী— দু’জনেরই জীবনকার্য ও উপদেশ ভারতের গৌরব ও সামাজিক একতার জন্যই ছিল।

এসব স্মরণ কারার কারণ হলো, আজও আমার-আপনার পরিবার থেকে শুরু করে সারা বিশ্বের সমৃদ্ধি, শান্তি ও উন্নতির জন্য আমাদের বিবেকও সমৃদ্ধ, সমর্থ ও সমরস ভারত নির্মাণের জন্য আমাদের আহ্বান করছে। সারা সমাজের সংগঠিত শক্তির ভিত্তিতে বিজয়প্রাপ্ত করার পথই আজ আমাদের বিচার্য বিষয়।

জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বিজিগীষু নীতির ভিত্তিতে স্বাবলম্বী, সামর্থ্যসম্পন্ন, বৈভবসম্পন্ন, পূর্ণ সুরক্ষিত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে মঙ্গলপ্রদ উৎকর্ষকারক নেতৃত্বদানকারী ভারত নির্মাণ তখনই সম্ভব হবে যখন সমতাযুক্ত, শোষণমুক্ত, গৌরবসম্পন্ন, সংগঠিত ও প্রবুদ্ধ সমাজের উদ্যম সেই নীতির সমর্থনে চলবে এবং এমন সমাজের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যবস্থার ও তার সাংবিধানিক কর্তাদের পথনির্দেশক হবে। জাগ্রত, পরিস্ফুট, অব্যর্থ নীতি এবং স্বার্থভেদরহিত বিবেকসম্পন্ন সমাজ— এই দুই কর্মসম্পাদক দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য অনিবার্য। এজন্য তাদের উভয়পক্ষের পরিপূরক হয়ে চলা আবশ্যক।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে যখন দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করা হয় তখন খুবই সুখদায়ক ও আশাব্যঞ্জক চিত্র সামনে আসে। দু' বছর আগে যে নিরাশা ও অবিশ্বাসের পরিবেশ ছিল তা এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষাপূর্তির বিশ্বাসযোগ্য বাতাবরণ নির্মাণ হয়েছে। সেই বাতাবরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেশের অন্তিম পংক্তিতে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া এবং নিজ অভিজ্ঞতা থেকে নিজের ও দেশের ভাগ্য পরিবর্তনে সমাজের বিশ্বাসের মাত্রা নিরন্তর বেড়ে চলেছে— তার খেয়াল রাখতে হবে।

গত দু' বছরে খুব দ্রুতগতিতে বিশ্বে ভারতের প্রতিষ্ঠা বেড়েছে, এটা সবাই অনুভব করছেন। দেশের হিতের কথা মনে রেখে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার সফল পরিণামও দেখা দিতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে যে, বিশ্বে আধুনিক ভারতের একটা আলাদা নতুন পরিচয় মিলেছে। স্ব-গৌরব ও আত্মবিশ্বাসযুক্ত হয়ে সারাবিশ্বের প্রতি পরম্পরাগত সদ্‌ভাবনাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রেখে দৃঢ়তাপূর্বক দেশহিত রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কুটনীতিতে নিজের বক্তব্য রাখা, বিশ্বের যে-কোনো দেশে উৎপন্ন সঙ্কটে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া ভারতের সুন্দররূপ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে দেখে বিশ্বের দেশগুলি হতচকিত, বিস্মিত এবং নতুন আশায় আশান্বিত। ভারতের গীতা, ভারতের যোগদর্শন এবং ভারতের তথাগত বুদ্ধ বিশ্বমান্য হতে চলছে। ভারতীয় মানস এবং পরম্পরার শ্রদ্ধার বিষয়ে সজাগ হওয়া ও তার মর্যাদা ও সুরক্ষার জন্য নীতিগত পদক্ষেপও শুরু হয়েছে। তথাকথিত মহাশক্তিধর দেশের অবাঞ্ছিত প্রভাবজাল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উন্মুখ উন্নয়নশীল জগৎ নেতৃত্বের জন্য ভারতের দিকে চেয়ে আছে। ভারতবর্ষ তার উন্নত বা অবনত অবস্থাতেও বিশ্বকে আত্মীয় মনে করে সামর্থ্য ও শক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রহিত ও বিশ্বহিত উভয় দায়িত্ব সৎভাবে পালন করার পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কুটনৈতিক স্তরে সেই শৈলীর কিছু কিছু অনুভব আবার দেখা দিতে শুরু করেছে। বিশ্বের সামনে ও দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভারতের এই দেদীপ্যমান স্বরূপ প্রস্ফুটিত হোক এটা অবশ্য প্রয়োজন। তার জন্য জাতীয় জীবনের সমস্ত দিকে আমাদের নতুন ভাবনাচিন্তা ও নতুন কর্মোদ্যোগের সৃষ্টি করতে হবে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা আমাদের অক্ষুণ্ণ রাষ্ট্রজীবনের মূল ও সর্বহিতকারী সত্যের ভিত্তিতে যুগানুকূল নীতি, তদনুকূল ব্যবস্থা এবং তাকে ধরে রাখবার ক্ষমতাসম্পন্ন সমাজ নতুনভাবে তৈরি করতে হবে।

'সাহেব বাক্য প্রমাণম্'-এর মতো মানসিক দৈন্য মন থেকে সম্পূর্ণভাবে উৎপাটন করে ভারতীয় মন ও ভাবনার ভিত্তিতে বিশ্বের যা কিছু ভালো, উচিত ও সত্য তা গ্রহণ করতে হবে এবং তা দেশোপযোগী তৈরি করে নিজের দেশের জন্য সময়োপযোগী পথের স্বতন্ত্র ভাবনা সমাজে, বিদ্বান ও চিন্তাবিদদের, প্রশাসক ও প্রশাসনে, সরকার ও নীতির মধ্যে ভাবনা ও আচরণের পরিবর্তন আনতে হবে। এছাড়া বিশ্বের সামনে উদাহরণস্বরূপ, স্বাবলম্বী, সমতাযুক্ত, শোষণমুক্ত, সামর্থ্যসম্পন্ন ও সমৃদ্ধ ভারত নির্মাণ সম্ভব নয়। কয়েক শতাব্দী ধরে ভাবনা-চিন্তা যে দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আবর্তিত হচ্ছে তার অসারবত্তা বৈজ্ঞানিক কষ্টিপাথরেও প্রমাণিত হচ্ছে এবং সেই অসার চিন্তনের পরিণাম-অভিজ্ঞতাও সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তনেরই পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করছে।

১৯৫১ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সামাজিক ও আর্থিক কার্যবিভাগ এই অসার চিন্তনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে বলেছিল— There is a sense in which rapid ecomomic progress is impossible without painful adjustments. Ancient philosophies have to be scrapped ; old social institutions have to disintegrate. Bonds of caste, creed and race have to burst and large numbers of persons who cannot keep up with the progress have to have their expectations of a comfortable life frustrated. Very few communities are willing to pay the full price of economic progress.

অত্যন্ত জড়বাদী, ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক এবং সংবেদনহীন এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর সর্ববিদিত পরিণামের অভিজ্ঞতা যখন এর উদ্ভাবকদের হতে শুরু করে তখন তাদের ভাষা একেবারে 'ইউ টার্ন' নিয়ে নেয়। ২০০৫-এর অক্টোবরে জি-২০ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরগণ ঘোষণা করেন :

We note that development approaches are evolving over time and thus need to be updated as economic challenges unfold. ...We recognize there is no uniform development approach that fits all the countries. Each

country should be able to chose the development approaches and policies that the best suit its specific characteristics while benefitting from their accumulated experience in policy making over last decades, including the importance of strong macroeconomic policies for sustained growth.

পরে ২০০৮ সালে আরো বেশি স্পষ্টতার সঙ্গে এই কথার প্রতিধ্বনি করে বিশ্বব্যাঙ্কের সমাচার বুলেটিনে লেখা হয়— In our work across the world we have learnt the hard way that there is no one model that fits all. Development is all about transformation. It means taking the best ideas, testing them in new situations and throwing away what doesn't work. It means, above all, having the ability to recognize when we have failed. This is never and easy thing to do. It is ever more difficult for an organization to do so, be it the government or the World Bank, which constantly need to adapt to the changing nature of developmental challenge.

এই আত্মানুভূতির পর বিকাশকে লক্ষ্য করে চলা কথাবার্তায় 'সামগ্রিকতাবাদী' (Holistic), 'ধারণক্ষম বিকাশ' (Sustainable Development) ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ শোনা যেতে শুরু করে। পরিবেশ বিষয়েও কিছু কিছু দুশ্চিন্তা ব্যক্ত হতে শুরু করে। এজন্য প্রয়োগ-অনুভব-পরিবর্তনের চক্রে ফেঁসে থেকে অসার দৃষ্টিভঙ্গিকে ধ্রুবসত্য হিসেবে মেনে নেওয়ার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের স্বয়ং সময়সিদ্ধ শাশ্বত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই চলা উপযুক্ত হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বয় ও সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, জীবনকে অর্থ-কামপ্রধান নয়, ধর্ম ও সংস্কারপ্রধান বলে মনে করে। ধারণক্ষম বিকাশের জন্য ন্যূনতম কম শক্তি ব্যয়, অধিকতম রোজগার; পরিবেশ, নৈতিকতা, কৃষির পরিপূরকতা এবং স্বাবলম্বন ও বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার উৎসাহ দানকারী শিল্পকর্মকে মান্যতা প্রদান করে। উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে দক্ষতার ওপর জোর দেওয়া হয়। দেশের শেষ সারিতে থাকা শেষ ব্যক্তির অভাব, অশিক্ষা ও অপমান থেকে মুক্তি এবং এই শ্রেণীর বিকাশ— আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্রীয় বিকাশের ভিত্তি ও বিকাশের উদাহরণ মনে করা হয়। এর জন্য কৃষি ও কৃষক; লঘু, মধ্যম ও কুটির শিল্প, ছোট ব্যবসায়ী ও কারিগর সবার প্রতি বেশি নজর দিতে হবে। আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করা সমস্ত সংগঠন, চিন্তাবিদ, কার্যকর্তা, নীতি নির্ধারক, সরকার, প্রশাসন সবাইকে এ বিষয়ে সজাগ থাকা প্রয়োজন।

আনন্দের কথা যে, নীতি আয়োগের ঘোষণাপত্রে এ বিষয়ে পরিষ্কার সঙ্কেত পাওয়া গেছে। এটা স্পষ্ট যে, এই পরিবর্তন হঠাৎই হবে না। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আর্থিক স্থিতিকে সাধারণস্তরে আনা, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় ভারসাম্য আনা এবং কঠোর প্রশাসনিক নিয়ম কানুনকে সরল করা একটা চ্যালেঞ্জের বিষয়। তবু দেশের সাধারণ শ্রেণী পর্যন্ত উন্নয়নের সুফল পৌঁছনো এবং রাষ্ট্র নির্মাণে তাদের সহযোগিতা লাভ করা ও ধৈর্যসহকারে পরিণামের প্রতীক্ষা করা— সবই সবাইকে করতে হবে। মুদ্রা ব্যাঙ্ক, জন-ধন যোজনা, গ্যাসের ভরতুকি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, নৈপুন্য বৃদ্ধি (স্কিল্ ডেভলপমেন্ট) এরকম কিছু উপযোগী পদক্ষেপ এই দৃষ্টিতে সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রকাশ করা এবং উন্নয়নকার্যে সবাইকে সহযোগী বানানোর দৃষ্টিতে সমাচার ও ক্রিয়ান্বয়নে গতি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা আছে।

দেশের ভাগ্য পরিবর্তনে সর্বপ্রকার নীতির সাফল্য সমাজের উদ্যম, সহযোগিতার শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করে। সমাজের জাগরণ ও প্রশিক্ষণ এর জন্য অনিবার্য শর্ত। আজকাল উন্নয়নের চিন্তা করার সময় দেশের জনসংখ্যাও এক ভাবনার বিষয় তৈরি হয়ে যায়। আমাদের দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি বিচারবিবেচনা করে তৈরি করতে হবে। জনসংখ্যা ভার না সম্পদ— তা দু' ভাবেই বিবেচনা করে দেখা উচিত। ৫০ বছর পর আমাদের দেশের সম্পদ এবং ব্যবস্থা কত লোকের পালন-পোষণ, রোজগার এবং জীবনধারণের সুযোগ-সুবিধা দিতে পারবে? ৫০ বছর পর আমাদের দেশকে সঠিকভাবে চালানোর জন্য কত হাতের

* আজ সারা দেশে আশা ও বিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।
* বিশ্বে ভারতের প্রতিষ্ঠা বেড়েছে।
* বিশ্ব প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে।
* দেশের শেষ সারিতে থাকা শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নের সুফল পৌঁছনো দরকার।
* চাই 'এক আইন'।
* আমাদের দেশে 'এক জনসংখ্যা' নীতি তৈরির প্রয়োজন।
* পরম্পরার পুনর্বিচার ও পরিবর্তন কাম্য কিন্তু তা জন্য বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বিপদের জন্ম দেয়।
* শিক্ষাপদ্ধতির সমস্ত বিভাগে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনার কথা ভাবতে হবে।
* বিবিধতাকে স্বীকার ও সম্মান প্রদর্শনকারী আমাদের সনাতন সংস্কৃতিই হিন্দু সংস্কৃতি।

প্রয়োজন পড়বে? সন্তানকে বড় করার কষ্ট ও তার মন সংস্কারিত করার কাজ মা'কে করতে হয়। তার পালনপোষণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, আত্মমর্যাদার রক্ষা, সক্ষম করে তোলা, জ্ঞানালোক প্রাপ্ত করা, তার জন্য সুযোগ এবং লাভ নিতে পারার স্বাধীনতা— এসব কীভাবে হতে পারবে? ৫০ বছর পর আমাদের দেশের পরিবেশ পরিস্থিতির আমাদের কল্পনা কিরূপ? বিগত দু'টি জনগণনার পরিসংখ্যান সামনে আসার পর জনসংখ্যার স্বরূপ এবং তাতে উৎপন্ন হওয়া ভারসাম্যহীনতারও পর্যাপ্ত চর্চা হয়ে চলেছে। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ওপরও তার পরিণাম হয় ও হচ্ছে। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠে এই সব কথাকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করে সারা দেশের মানুষের জন্য 'এক জনসংখ্যা' নীতি তৈরির প্রয়োজন আছে। সেই নীতি কেবলমাত্র সরকার ও আইনের বলে প্রয়োগ হবে না। তাকে গ্রহণ করার জন্য সমাজের মনোভূমিকা তৈরির প্রয়াসও পর্যাপ্তমাত্রায় করতে হয়। তার ভাবনা নীতি তৈরির সময়েই করা উচিত কাজ হবে।

মানুষের সহজ প্রবৃত্তি, পন্থ-সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত আচার-আচরণ, সমাজে চলে আসা সাংস্কৃতিক পরম্পরা— এগুলি এমন বিষয় যা দেশ-কাল-পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তনের প্রয়োজন বা উচিত মনে হলেও তা কেবলমাত্র আইনের দ্বারা অথবা তার পিছনে সরকারি শক্তির বলে কখনো হয়নি আর কখনো হবে না। এরকম পরিবর্তন করার আগে ও পরেও সমাজ জাগরণ দ্বারা মনোভূমিকা তৈরির প্রয়াস সরকার, প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম এবং সমাজের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব ও সজ্জনদের সতত করতে হয়। সস্তা জনপ্রিয়তা অথবা রাজনৈতিক লাভ ওঠানোর মোহ দূরে রেখে সত্যের পথে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর প্রতি আত্মীয়তাপূর্ণ ভাব রেখেই সমাজের মনোভূমিকা জাগরণের দ্বারা পরিবর্তন করা যেতে পারে। সম্প্রতি এমনকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যার ফলে সম্পর্কিত শ্রেণীর মধ্যে ক্ষোভ উৎপন্ন হয়— এর থেকে বাঁচা যেতে পারতো। উদাহরণরূপে, জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সান্থারা--- দিগম্বর আচার্যদের বিশিষ্ট জীবনক্রম, বাল্যদীক্ষা ইত্যাদি পদ্ধতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। সেই পরম্পরার কারণ, মহত্ত্ব ও তার পিছনের ভাবনা ইত্যাদি ওই সম্প্রদায়ের আচার্যদের সঙ্গে চর্চা ও গভীরভাবে উপলব্ধি না করে তাদের সঙ্গে অশিষ্ট ব্যবহার করা সমাজের এবং সর্বোপরি দেশের পক্ষে ঘাতকস্বরূপ হবে। প্রত্যেক পন্থ সম্প্রদায় তাদের মানবিন্দু ও পরম্পরাগুলিকে সময়ে সময়ে বিশ্লেষণ করে, দেশ-কাল-পরিস্থিতি অনুসারে তাতে পরিবর্তন করে, মূল্যবোধের কালসঙ্গত আচরণের রূপ খাড়া করে চলেছে— এটাও আমাদের দেশের পরম্পরা। সেই অনুসারে পরম্পরার পুনর্বিচার ও পরিবর্তন হওয়াও খুব ভাল। কিন্তু এই কাজ সেই শ্রেণীর মধ্যে থেকেই প্রতিবার করা হয়। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কেবল বিবাদেরই জন্ম দিয়ে এসেছে। যে কোনো ব্যবস্থার পরিবর্তন সমাজমন পরিবর্তনের শক্তিতেই যশস্বী হয়।

পরিবর্তনের জন্য সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো শিক্ষাব্যবস্থা। বর্তমানে তার বাণিজ্যিকীকরণ হতে চলেছে। এজন্য তা দুর্মূল্য হয়ে সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে যেতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে বিবেক, আত্মমর্যাদা ও আত্মগৌরবে পরিপূর্ণ, সংবেদনশীল, সক্ষম, সুসংস্কৃত মানুষ হওয়া। এই দৃষ্টিতে একাত্মতার সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতির অনেক প্রয়োগ দেশে ও বিশ্বেও চলছে। সেই সমস্ত প্রয়োগগুলি সঠিকভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন। তার তাৎপর্য ও আজ পর্যন্ত শিক্ষা বিষয়ে অনেক শিক্ষাবিদ, সংগঠন এবং কমিশনের দেওয়া উপযুক্ত পরামর্শগুলি অধ্যয়ন করে, পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে শিক্ষা পরিচালন, আর্থিক ব্যবস্থা ইত্যাদি শিক্ষাপদ্ধতির সমস্ত বিভাগ পর্যন্ত কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনার কথা ভাবতে হবে। শিক্ষা সমাজভিত্তিক হওয়া উচিত। শিক্ষার অভিমুখ ও তার উদ্দেশ্য এবং বর্তমান সময়ের আবশ্যকতা দুই-ই পরস্পরের পরিপূরক হোক— এ বিষয়ে স্বাধীনতাও দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার যাতে বাণিজ্যিকীকরণ না হয় এজন্য সরকারেরও সমস্ত স্তরে শিক্ষা সংস্থান ভালভাবে চালানো প্রয়োজন। সমস্ত প্রক্রিয়ার শুরু শিক্ষকদের থেকে এবং তাঁদের দায়িত্ববোধ, গুণাত্মক প্রশিক্ষণ ও প্রামাণিকতার দ্বারা করতে হবে।

কিন্তু এসবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অভিভাবকরা অর্থাৎ সমাজেরও দায়িত্ব এই প্রক্রিয়ায় খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কি নিজের আচরণে আমাদের ছেলে-মেয়েদের শেখাই যে, জীবনে সফলতা প্রাপ্তির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধসম্পন্ন জীবন? আমরা কি নিজের আচরণে সত্য, ন্যায়, করুণা, ত্যাগ, সংযম, সদাচার ইত্যাদির গুরুত্ব নতুন প্রজন্মের মনে সঞ্চারিত করতে সফল হচ্ছি? আমাদের নয়া প্রজন্ম কি এই প্রকার ব্যবহার ও আচরণে সামাজিক ও পেশাগত কার্যকলাপে ছোটখাটো লাভক্ষতি উপেক্ষা করে আগ্রহপূর্বক ও সক্রিয়তা সহকারে করছে? আমাদের করা-বলা-লেখায় সমাজ বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম একাত্মতা, সমরসতা ও নৈতিকতার দিকে এগুচ্ছে কিনা তার খেয়াল আমরা সমাজ জাগরণকারী নেতৃবৃন্দ ও সংবাদমাধ্যম রাখছি কি?

প্রশাসন প্রক্রিয়া, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। 'যথা রাজা তথা প্রজা'— এটা সত্যের একটি দিক। এজন্য নীতিসমূহ সমাজে একত্মতা সৃষ্টিকারী ও দুর্বলতম ব্যক্তির উন্নতির কথা ভেবে সমাজের সবার উন্নতি সাধনকারী হতেই হবে। আমাদের দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা, প্রশাসন, কর ব্যবস্থা, শিল্পনীতি, শিক্ষানীতি, কৃষিনীতি ও সার্বজনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদিতে আমূল সংস্কার করে

আরো বেশি ব্যবস্থিত ও জনপ্রিয় করার প্রয়োজন আছে। পাকিস্তানের শত্রুতাবৃদ্ধি, চীনের আধিপত্যবাদ, সারা বিশ্বে কট্টরতা ও অহঙ্কার বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবা খেলায় চলে আসা অন্যান্য কুটনৈতিক কারণে সৃষ্টি হওয়া আই এস আই এস-এর সঙ্কট— এ সবের কারণে আমাদের দেশের সীমান্ত ও অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার বিষয়টি আরো জটিল ও গম্ভীর আকার ধারণ করতে চলেছে। অন্য দেশের সমর্থিত অথবা অন্য দেশের মতাদর্শে বিশ্বাসী জেহাদের জন্য বিপথগামী হওয়া কিছু সংখ্যক লোক আমাদের দেশেও আছে। 'এক আইন' তৈরি করে দৃঢ়তাপূর্বক এইসব সমস্যার সমাধান করা সরকারের কর্তব্য— এ কথা সবাই মানেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপোষণ হোক, তার ক্রমাবনতি বন্ধ হোক, এজন্য শিক্ষার সুযোগ্য ব্যবস্থা শিক্ষানীতিতে আসা, সংবাদমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা রেখেও জ্ঞানত বা অজ্ঞানতা কুপ্রভাব নির্মাণে নিয়ন্ত্রণ রাখাও সরকারের ভাবনাচিন্তায় আসা প্রয়োজন--- এমনও বহুলোক ভাবছেন। তৈরি হওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ কাজ হোক, যেখানে হচ্ছে তার গতি বৃদ্ধি হোক— এ ভাবনাও সঠিক। কিন্তু এই সত্যের অতটাই গুরুত্বপূর্ণ অন্য একটি দিক হলো, বিশ্বে ও আমাদের দেশেও সমাজের ইচ্ছা, গুণবত্তা এবং সংগঠিত অবস্থার সংযোগের ফলে ব্যবস্থা ও সরকার নিয়ন্ত্রিত হয়। নিজের স্বত্বকে জেনে, জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে, স্বার্থ ও ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে ওঠে সমাজ যখন দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করবে তখন ব্যবস্থা তার সহায়ক হয়, পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হয় এবং পরিবর্তনে পূর্ণ সহায়ক হয়। সরকার, প্রশাসন ও জনগণ— তিনটি এককের মনে স্বরাষ্ট্র স্বরূপের পরিষ্কার ধারণা, তার প্রতি গৌরববোধ, সৎ রাষ্ট্রনিষ্ঠা, সুসংগঠিত অবস্থা ও তার ভিত্তিতে একইরকম ভাবনা এবং দীর্ঘ প্রয়াসের ক্ষমতা যখন নির্মাণ হয় তখনই কোনো রাষ্ট্র সুরক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, সম্পন্ন ও সুখী হয়।

আমাদের বৈচিত্র্যময় সমাজকে সংগঠিত করতে পারা সূত্র কী? (১) নিশ্চিতরূপে তা হলো সমস্ত বিবিধতাকে স্বীকার ও সম্মান করা। আমাদের সনাতন সংস্কৃতিই হিন্দু সংস্কৃতি। (২) সেই সংস্কৃতির আচরণেই আমাদের পূর্ব-পুরুষরা জীবন গঠন করেছিলেন, তার পালন-পোষণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, তার সুরক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন, সেই গৌরব আমাদের জন্য আজও প্রেরণা ও আদর্শ হয়ে আছে। (৩) যে সুজলা সুফলা চৈতন্যময়ী মাতৃভূমিতে আমাদের সেই সংস্কৃতির মূল সত্যের এবং উদ্ভূত ধর্মের দর্শন হয়েছে, যার দিব্য সমৃদ্ধি ও পোষণে আমাদের উদার চিত্ত ও সৎপ্রবৃত্তি নির্মাণ হয়েছে, তার প্রতি প্রেমভক্তি আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি এবং তা আজও দেশের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে পৌরুষ জাগরণের ক্ষমতা রাখে। এই তিন সূত্র থেকে নিজের ভাষা, প্রদেশ, সম্প্রদায়, দল ইত্যাদির বিবিধতাকে সুরক্ষিত রেখেও ব্যক্তি সহজেই একাত্ম হতে পারে। নিজের ক্ষুদ্র পরিচিতি সুরক্ষিত রেখে সমাজের বিরাট পরিচিতির অঙ্গ হয়ে যায়। এই সূত্রের ভিত্তিতে মানবতাপূর্ণ পৌরুষ, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবনা ও তদনুরূপ সিদ্ধান্ত এবং অবিরোধী আচরণকেই আমরা হিন্দুত্ব বলি।

হিন্দু সমাজের এই জীবনপদ্ধতি অতি প্রাচীনকাল থেকে— 'হিন্দু' শব্দ উৎপন্ন হওয়ার অনেক আগে থেকেই— এই ত্রিসূত্রের ভিত্তিতে যুগানুকুল রূপকে ধারণ করে বয়ে চলেছে। এই দেশের ভালোমন্দের দায়িত্ব শুধুমাত্র তাদের ওপরে আছে। আমাদের এই হিন্দুস্থানের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ হিন্দু সমাজের সঙ্গে একাত্ম।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গত ৯০ বছর ধরে দেশের ভাগ্যবিধাতা হিন্দু সমাজকে দেশের জন্য পরিশ্রমযোগ্য করার অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এটা খুব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে, দেশহিত, রাষ্ট্রহিত, সমাজহিতের কাজ কাউকে ঠিকা দেওয়া যেতে পারে না। সমাজকেই সংগঠিত ও যোগ্য তৈরি করে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করতে হবে, তবেই দেশ বৈভবসম্পন্ন হয়। সমাজের এই নির্মাণকারী কার্যকর্তাদের গড়ার কাজই করে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সঙ্ঘের এই সরল ও আড়ম্বরহীন কার্যপদ্ধতিতে তৈরি হওয়া স্বয়ংসেবকদের কর্তৃত্ব আজ সবাই দেখতে পাচ্ছেন। তাঁরা আজ সমাজের স্নেহ ও বিশ্বাসের কৃতজ্ঞভাগী; ভারত এজন্য জগৎ মান্যতাও লাভ করছে।

আসুন, আমরা সবাই এই পবিত্র কাজের সহযোগী স্বয়ংসেবক হই। কেননা বিশ্বের প্রয়োজন মনে হচ্ছে যে, নতুন পথপ্রদর্শনকারী ভারত নির্মাণের এটাই একমাত্র পথ। ভারতীয় সমাজকে তার সনাতন পরিচিতির ভিত্তিতে দোষশূন্য ও সংগঠিত হতেই হবে। নিঃশঙ্ক ও নির্ভয় হয়ে সর্বপ্রকার ভেদভাবকে সমাপ্ত করে এবং মানুষমাত্রকেই প্রকৃত স্বাধীনতা দিয়ে মানবতা ও বন্ধুভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধের অমৃত সিঞ্চনে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত আচরণে মানব সমাজকে সুখ, শান্তি ও মুক্তি দিতে হবে। এটাই উপায়, এটাই করতে হবে—

হিন্দু হিন্দু এক রহেঁ
ভেদভাব কো নহীঁ সহে
সংঘসোঁ সে দুঃখী জগৎ কো
মানবতা কী শিক্ষা দেঁ।।

।। ভারতমাতা কী জয়।।

(বিজয়াদশমী উৎসব উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের ভাষণের বঙ্গানুবাদ)

With Best Compliment-

Ecomoney Insurance Brokers Pvt. Ltd.

কোটিপতি হোন!

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন

১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

9830372090
9433359382

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী প্রণীত গবেষণামূলক অনবদ্য গ্রন্থরাজি—

ইসলামী ধর্মতত্ত্ব : এবার ঘরে ফেরার পালা	১৫০.০০
নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন (১ম ও ২য় খণ্ড), প্রতিখণ্ড	১০০.০০
মিথ্যার আবরণে দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি	৭০.০০
ভারতীয় ইতিহাস শাস্ত্র ও কালক্রম	১২.০০
ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা	১০.০০
পুরুষার্থ প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা	৩৫.০০
এক নজরে ইসলাম	৪০.০০
বিপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যত	৪.০০
ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত	৩.০০
অন্তিম গতি : আল্লার পতিতালয়	১০.০০
ইসলামে নারীর স্থান ও পর্দাপ্রথা	১৫.০০
इसलाम के तीन सिद्धान्त	১৫.০০
Three Decrees of Islam	২০.০০
Falsehood shrouds the True History of Delhi and Agra	১৫০.০০

—: প্রাপ্তিস্থান :—

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, যোগাযোগ : ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫, ৯৪৩৩০৩৩২৬৪

তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

হাঁপানিতে হোমিওপ্যাথি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

হাঁপানি এমন একটা অসুখ যাতে আমাদের শ্বাসনালীর বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সঙ্কোচন হয়। লজ্জাবতী লতার গায়ে হাত দেওয়া মাত্রই যেমন গুটিয়ে যায় তেমনি হাঁপানি রোগীর শ্বাসনালী আপনা আপনি বা সামান্যতম উস্কানিতে সঙ্কোচন হয়ে যায়। ফলে রোগীর শ্বাস নিতে ও ছাড়তে কষ্ট হয় এবং রক্ত পরিশোধনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক রোগ, যার নাম হাঁপানি বা অ্যাজমা।

কোনো অ্যালার্জিক বা উত্তেজক বস্তুর প্রভাবে অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষের হাঁপানি দেখা দিতে পারে। যেমন—

১। ফুলের রেণু বা পরাগ।

২। ঘরদোরের ধুলোয় অবস্থিত মাইট নামক এক প্রকার কীট।

৩। পাখির পালক।

৪। জীবজন্তুর লোম।

৫। ছত্রাকের বীজগুটি।

৬। কিছু খাদ্য।

৭। কিছু ওষুধ।

৮। শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত কোনো রাসায়নিক পদার্থ অ্যালাজেন শরীরের প্রবেশ করলে শরীরের আক্রমণ প্রতিরোধ প্রক্রিয়ার প্রভাবে মুক্ত মাস্ট কোষগুলি ভেঙে গিয়ে হিস্টামিন রোভিকাইনিন, লিউকোট্রিন, প্রস্টাগ্লানডিনস ইত্যাদি আরও অনেক ধরনের পদার্থ নির্গত হয়। আর এদের প্রভাবে ক্লোম (ব্রংকাই) ও অনুক্রোম নালীর সঙ্কোচন ঘটে ফলে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। এই প্রদাহ বৃদ্ধি হাঁপানির মূল কারণ। এছাড়া শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাস সংক্রমণ হাঁপানির অন্যতম কারণ। বিভিন্ন ঋতু ও আবহাওয়ার প্রভাবেও হাঁপানি হতে পারে। শারীরিক অসুখ বিসুখ কিংবা

মানসিক চাপ, আবেগ, উৎকণ্ঠা থেকেও হাঁপানি হতে পারে। হাঁপানি কিছুটা হলেও বংশানুগতিক ধারার উপর নির্ভরশীল। তাদের শরীরে হাঁপানির প্রভাব থাকলে উত্তেজক বস্তুর সংস্পর্শে আসলে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। হাঁপানি রোগী চিনতে সাধারণত কোনো কষ্ট হয় না। হাঁপানি ছাড়াও আরও অনেক কারণে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হৃদযন্ত্রের আকস্মিক অকেজোভাব। তাছাড়া ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি কারণে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। রক্তপরীক্ষার মাধ্যমে ইয়োসিনোফিলের পরিমাণ দেখা ও অ্যালার্জি পরীক্ষা করে দেখে হাঁপানি রোগ নির্ণয় করা যায়। হাঁপানি প্রতিরোধের উপায় তবে কি?

১। অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধের কম ব্যবহার।

২। ধুমপান না করা।

৩। মদ্যপান থেকে বিরত হওয়া।

৪। মানসিক বাধা কমানোর প্রয়োজন।

৫। পেশাগত কারণে হাঁপানি হলে সেই পেশা বদলানোর প্রয়োজন।

হাঁপানিতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে। ▮

সবার প্রিয়
®
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

প্রয়াত বিনয়কৃষ্ণ রস্তোগীর স্মরণসভা

বিশিষ্ট সমাজসেবী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা বাংলার প্রাক্তন প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রমুখ এবং শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত বিনয়কৃষ্ণ রস্তোগীর স্মরণসভা গত ২৮ অক্টোবর কলকাতায় কুমারসভা পুস্তকালয়ের সভা ঘরে হয়ে গেল। গত ১৮ অক্টোবর তিনি নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন তিনি বাধ্যর্কজনিত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে আইনজীবী প্রয়াত রস্তোগীর জন্ম ১৯২৯ সালে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর। তাঁর স্ত্রী কয়েক বছর আগেই প্রয়াত হন। বর্তমানে তিনি দুই পুত্র এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে রেখে গেছেন। সঙ্ঘের বাংলা প্রদেশের কাজের তিনি অন্যতম ভিত্তিপ্রস্তর ছিলেন।

বিনয়জীর জীবন ও ব্যবহার কার্যকর্তাদের কাছে প্রেরণার উৎস ছিল বলে স্মৃতিচারণ করেন সভার সভাপতি যুগল কিশোর জৈথলিয়া। অন্যের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করতেন বলে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, তিনি সার্থকনামা। নিজের নামের মতোই তিনি বিনয়ী ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে স্মৃতিচারণ করেন মহাবীর বাজাজ, নন্দলাল সিংহানিয়া, ভঁবরলাল মুনধ্রা, অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, রাজেন্দ্র প্রকাশ বনসল, ব্রহ্মানন্দ বংগ, ভাগচাঁদ জৈন, রবিকৃষ্ণ রস্তোগী প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠি।

Jagan
JLI
JANANI LOGISTICS OF INDIA
(Every Thing is Possible in India)
H.P.L. Link Road, Back Side of SAB NURSING HOME
Haldia - 721 602 (W. B.)
Cell : 09932367874, 09333824694, Telefax : 03224-272074
E-mail : jananilogisticsofindia@gmail.com

সমাবেশ সমাচার

শোকসংবাদ

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার কালিনগর খণ্ডের সঙ্ঘানুরাগী তারাপদ ঘোড়ুই গত ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরে কর্মজীবন সম্পূর্ণ করে অবসর গ্রহণ করেন। স্ত্রী, তিন পুত্র, তিন পুত্রবধূ, তিন নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি স্বস্তিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন।

***

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কালিনগর খণ্ডের শারীরিক প্রমুখ অভিজিৎ মালিকের পিতা কমল মালিক গত ২২ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। তিনি ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও তিন পুত্র রেখে গেছেন।

***

হাওড়া জেলার আমতা মহকুমার উদয়নারায়ণপুর খণ্ডের সম্পর্ক প্রমুখ কালিপদ বেরার কনিষ্ঠ পুত্র পথ দুর্ঘটনায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ২৫ বছর। তিনি স্ত্রী ও সদ্যোজাত কন্যা রেখে গেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ জানতে হলে পড়ুন
পশ্চিম বাংলাদেশ
মোহিত রায়
ক্যাম্প
২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩
ফোন : ২২১৯ ০৪৬৫

Harry & Co. Trading (Kolhapur) Pvt. Ltd.

Gram : Lalchatri

2235-3641, 2235-6483

54, Ezra Street, Block D-2
Kolkata - 700 001

With Best Compliments From :-

Shree Enterprises (Coal Sales) Pvt. Ltd.

Coal Merchants & Commission Agents

32, Ezra Street, Room No. 854,
Kolkata - 700 001
Phone (O) 2235-0277, 9934

SSC

SUPERSPEED CARRIERS PRIVATE LIMITED

2 Roopchand Roy Street, 3rd Floor, Room No. 309, Kolkata - 700 007
Phone : 32476907, Telefax : 2270 1163, Mobile : 98302 76002 E-mail : superspeed@dataone.in

শুভ দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

উমেশ গোয়েঙ্কা

নিয়ামতপুর, পো ঃ সীতারামপুর, জেলা - বর্ধমান

পূজা ও দীপাবলীর অভিনন্দন গ্রহণ করুন —

Shree Nursing Electric Stores

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

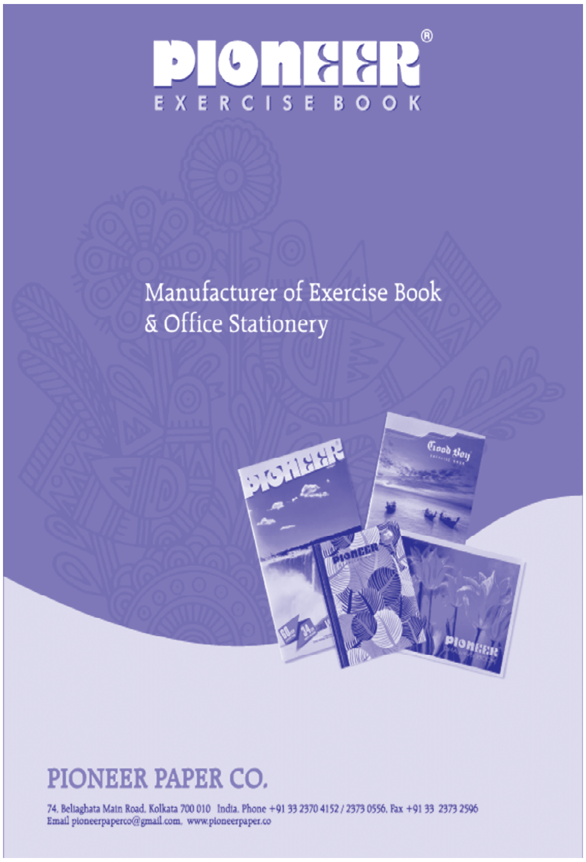

'যে প্রেমপূর্ণ হৃদয়-চন্দ্রাতপের মধ্যে আমরা চির নিরাপদ! সেই অতলস্পর্শী মাধুর্য পারাবার, অচ্ছেদ্য স্নেহবন্ধন, নিষ্কলুষ পবিত্রতা— মাতৃত্ব বলতে এসব এবং আরও কত কিছু বোঝায়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, সুখ বা দুঃখ যাই আসুক, শিশু যেমন মাতার বক্ষে পরম নির্ভরতায় অবস্থান করে, প্রত্যেক হিন্দুর অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা সেও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে। এ হল সেই স্বপ্ন, যাকে বলা হয় নির্বাণ বা মুক্তি। যেসব বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা আমাদের বদ্ধ করে রাখে, তার থেকে মুক্তিলাভ করাকেই বলা হয় ত্যাগ।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ভাবা যায়, ১৪ বার চ্যাম্পিয়নের খেতাবধারী এক ভারতীয়! বিলিয়ার্স ও স্নুকারে টাইম ও পয়েন্ট দু' ধরনের ফরম্যাট মিলিয়ে এতবার বিশ্বখেতাব জিতে পঙ্কজ আডবানী দেশবাসীর চোখে ঘোর লাগিয়ে দিয়েছেন। অতি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডে সিঙ্গাপুরের বৃটিশজাত কিংবদন্তী খেলোয়াড় পিটার গ্রিলক্রিস্টকে হারিয়ে নিজেকে এক দুর্লঙ্ঘ্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন বেঙ্গালুরুর পঙ্কজ। আর তিনটি বিশ্বখেতাব জিতলেই সর্বকালের সেরা 'কিউ খেলোয়াড় ইংল্যান্ডের

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের সংখ্যা বাড়ছে ভারতে

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইক রাসেলকে ধরে ফেলবেন তিনি। বয়স মাত্র ৩০। ফর্ম, ফিটনেস, আত্মপ্রত্যয় ও জেতার ক্ষিদে সব কিছু যদি পুরোমাত্রায় ধরে রাখতে পারেন পঙ্কজ তাহলে শুধু ধরে ফেলাই নয়, ছাপিয়ে গিয়ে কোথায় শেষ পর্যন্ত থামবেন তা সময়ই বলে দেবে। তবে ইতিমধ্যেই বিলিয়ার্সে স্নুকারের 'হল অব ফেমে'-এ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত পঙ্কজ আডবানী নিজেই এক মিথ হয়ে উঠেছেন। দাবার বিশ্বনাথন আনন্দ ও মহিলাদের বক্সিংয়ে মেরি কম পাঁচবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। দাবা আজ বিশ্বজনীন এক সংস্কৃতি। বিশ্বের প্রতিটি দেশে এর চর্চা ও প্রসার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সেদিক থেকে দেখলে বিশ্বনাথন আনন্দ সর্বকালের সেরা ভারতীয় ক্রীড়াবিদ। ভারতীয় হকির স্বর্ণযুগে ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং ও কে ডি সিং বাবুরা পরের পর অলিম্পিকে দেশকে বিজয়মঞ্চে তুলেছেন। কিন্তু তখন বেশি সংখ্যক দেশের প্রতিনিধিত্ব ছিল না আন্তর্জাতিক স্তরে। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও গুণগত উৎকর্ষের বিচারে 'ভিসি আনন্দই' এগিয়ে থাকবেন। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ নাসা এবছরই সৌরমণ্ডলে হঠাৎ আবিষ্কৃত এক 'গ্রহাণুর' নামকরণ করেছে তারই নামে। অন্যদিকে বিশ্বদাবা সংস্থা ফিডে 'ভিসি'কে ৬ বার অস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছে। আর চলচ্চিত্রের অস্কার পুরস্কারের

ন্যাশনাল বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন ট্রফি বিজয়ী পঙ্কজ আদবানী।

মতোই দাবার অস্কারের মহিমা।

ভারতবর্ষে নারীজাতির আদর্শ ও প্রেরণার আধার এখন মণিপুরের পাহাড় কন্যা মেরি কম। ভারতের এক অনুন্নত সমস্যাজর্জরিত রাজ্যের থেকে উঠে আসা মেরি প্রাচীন যুগের সেই সব মহিয়সী বীরবালাদের মতো জীবনের থেকেও বড় হয়ে উঠেছেন। পুরুষশাসিত সমাজ- ব্যবস্থায় অবহেলিত, নিষ্পেষিত এবং অত্যাচারিত মেয়েদের কাছে মেরিকম এক জলন্ত অতিমাত্রিক সত্তা। বক্সিংয়ের মতো 'অ্যাকসন' সর্বস্ব একটি খেলায় ৫ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়াই শুধু নয়, গোটা বক্সিং দুনিয়ার ক্যানভাসে ভারতীয় বক্সিংয়ের বর্ণময় এক রূপকল্প নির্মাণ করেছেন একার হাতে। সর্বোপরি অলিম্পিক ব্রোঞ্জপদক জেতার সুবাদে ভারতবর্ষে মেয়েদের বক্সিংকে সাবালক করে দিয়েছেন। যার প্রমাণ গত এশিয়াডে ভারতীয় মহিলা বক্সারদের পারফরমেন্স। টেনিসের সানিয়া মির্জা, ব্যাডমিন্টনের সাইনা নেওয়াল হায়দরাবাদের উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামোর ফসল। সানিয়া পেশাদার সার্কিটে একাধিক গ্রান্ডস্লাম জিতে বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ে একনম্বরে উঠে এসেছেন। এশিয়াড সোনাও আছে তাঁর জিম্মায়। পরের বছর রিও অলিম্পিকে পাখির চোখ করেছেন মহার্ঘ সোনার পদকের প্রতি। ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে খেলবেন সানিয়া। মিক্সড ডাবলসে ১৭ গ্রান্ডস্লাম ডাবলস জয়ী লিয়েন্ডার পেজকে জুটি করে খেললে স্বপ্নপূরণ হবার সম্ভাবনা। সাইনা নেওয়াল এবছর অল ইংল্যান্ড ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনাল খেলেছেন। স্পেনের ক্যারোলিন মারিনের কাছে দু'বারই ফাইনালে হারতে হয়েছে তাঁকে। ইদানীং চীনা খেলোয়াড়রা আর ততটা গাট নন সাইনার সামনে। তাই অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব খেতাব জেতা কোনো অলীক কল্পনা নয়। বিশ্ব খেতাব না জিতেও বেশ কয়েকটি মাস্টার্স ও সুপার সিরিজ টুর্নামেন্ট জিতে সাইনা এক নম্বর স্থানে উঠে এসেছেন এবছর। গলফের অনির্বাণ লাহিড়ী, শুটিংয়ের অভিনব বিন্দ্রা, রঞ্জন সোধীরাও ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছেন আন্তর্জাতিক পরিসরে। বিন্দ্রা প্রথম ব্যক্তিগত অলিম্পিক সোনাজয়ী ভারতীয় ক্রীড়াবিদ। এশিয়াড সোনাও এসেছে তাঁর হাত ধরে। একাধিক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পদক আছে। রঞ্জন সোধীও ট্রান অ্যান্ড স্কিটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়াই শুধু নয়, র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন। বেঙ্গালুরুর প্রবাসী বাঙালি গলফার অনির্বাণ লাহিড়ী যুক্তরাষ্ট্র পিজিএ মেজরে পঞ্চমস্থান পাওয়ার দৌলতে বিশ্বটিমে সুযোগ পেয়েছেন যা এক অনন্য ঘটনা। ■

ড. বিজয় আঢ্যের

পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে ₹২০০

বিপ্লব মজুমদারের

রণিদা রহস্য ট্রিলজি ₹২৫০

কালাচাঁদ রায়ের

ভালোবাসা থেকে যায় ₹২৫০

শতরূপা সান্যালের দুটি কাব্য গ্রন্থ

সোয়া ডজন ছড়া ₹১০০

ছড়ানো ছিটানো ₹১০০

অর্পা
একটি মননশীল পত্রিকা

সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে। গ্রাহক মূল্য ২০০
সম্পাদিকা : অর্পিতা দেবনাথ আইচ
মোবাইল : 9007528406

প্রিটোনিয়া
পাবলিশার্স অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউটরস্
visit: www.pritoniapublishers.com
email: publishers.pritonia2015@gmail.com

১৪ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
☎ ২২৪১-২১০৯
৬৪৫৪-২১০৯

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের
ফোল্ডিং ছাতা

বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana™
SAREES

Cotton Printed Sarees

Contact - 22188744/1386

দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

সুনীতা ঝাওয়ার

কাউন্সিলার ও বিজেপি নেত্রী

৪২ নং ওয়ার্ড, কোলকাতা পুরসভা

কিশান ঝাওয়ার

উত্তর-পশ্চিম কোলকাতা জেলা সভাপতি

বিজেপি

Lotus Rang Udyog

DEALS IN - DYES & CHEMICALS

26/4-A, Armenian Street.
Kolkata - 700 001

Phone : (O) 2268-9552,

2268-2717, 2218-2931

E-mail : rangjeet.Lunia@yahoo.in

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS

& SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71,

Park Street, Kolkata - 700 016

M : 98311 85740, 98312 72657,

Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

With Best Compliments from -

A Well Wisher

থাকে যদি
'ডাটা',
জমে যায় রান্নাটা
ডাটা®
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
DUTA
50g
TURMERIC
FRESH N' PURE POWDER
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
CHILLI
POWDER
Kasuri Methi
pure INDIAN SPICES
Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.
207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
9 November - 2015 - Rs. 10.00

National Seminar on
New Education Policy
7-8 November 2015
Venue: RKM Institute of Culture, Kolkata

ORGANISED BY

Vidyarthi Vikash
Kolkata

IN COLLABORATION WITH

Ramakrishna Mission Institute of Culture
Ramakrishna Mission Vivekananda University

All India Council for Technical Education (AICTE)
New Delhi

For Detail Contact:
Organising Secretary,
National Seminar on New Education Policy,
44, Baldeo Para Road, Kolkata-700006
Email: trivediraman62@gmail.com/nsonnep@gmail.com
Phone: 9432491149/9143016238
www.nsnep.in

Who can participate : Academicians, Academic administrators, Policy makers, Planners, Teachers, Researchers and students
Registration Fee :
General delegates : Rs. 500/-
Students : Rs. 200/-